মহিলাদের অধীকার বিষয়ক হাদিস

Hadith Regarding Women's Right

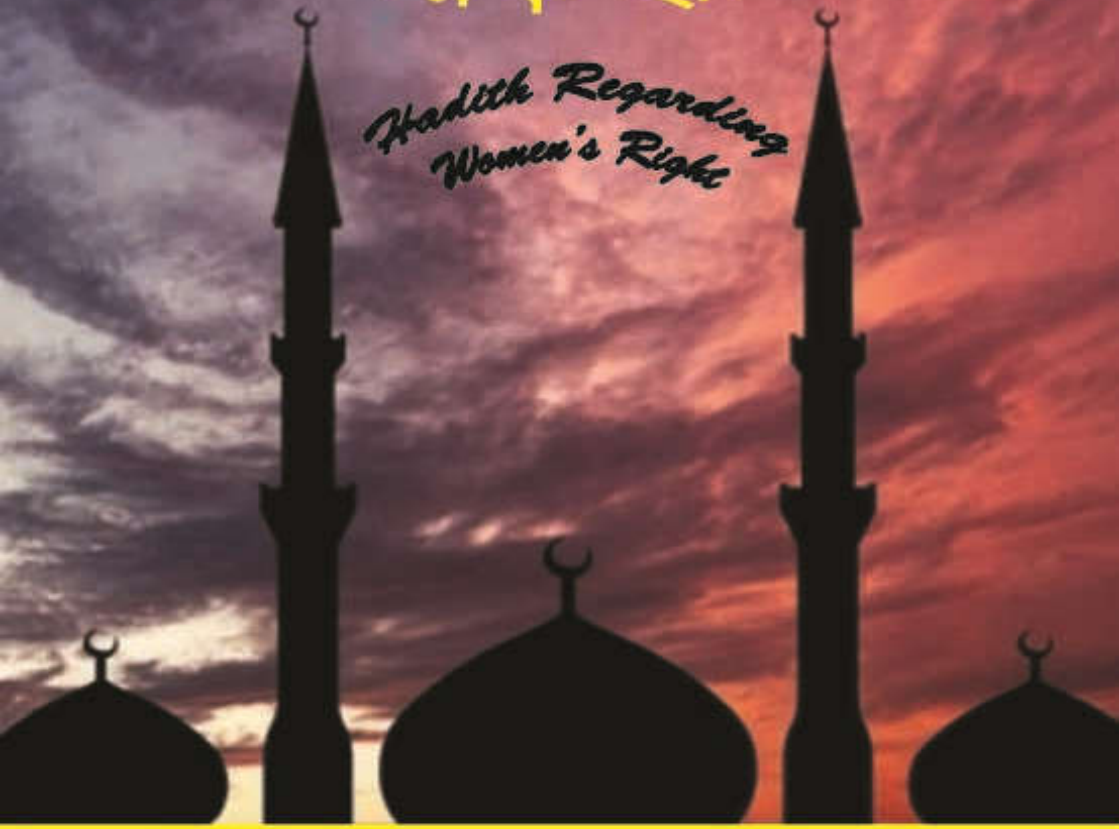

আলহাজ মোহাম্মদ আব্দুর রউফ বিন ইয়াকিন

প্রকাশকঃ বিস্‌মিল্লাহ্‌ লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী

ক-৩৪বি, খিলখেত সুপার মার্কেট, ঢাকা ১২২৯

কুর্মিটোলা হাই স্কুলের সামনে।

০১৭২৬-১৭৪৫৯০, ০১৯২৩-৭৬৩৭৪০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقرَأ

মহিলাদের অধীকার বিষয়ক হাদিস

Hadith Regarding Women's Right

সংকলক ও প্রকাশক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুর রউফ বিন ইয়াকিন
E-Mail- maroufbd2009@gmail.com

পরিবেশনায়:
বিস্‌মিল্লাহ্‌ লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী (কুর্মিটোলা হাই স্কুলের সামনে)
ক-৩৪ বি, খিলখেত সুপার মার্কেট, ঢাকা ১২২৯
০১৭২৬-১৭৪৫৯০, ০১৯২৩-৭৬৩৭৪০
https://leanpub.com/purified-eman-and-aqeeda
প্রকাশনার তারিখ: ১৪-১২-২০১৯, ১৪২৬ বাংলা, ১৪৪১ হিজরি

উপহার

শ্রদ্ধেয় / স্নেহের

.....

.....

পরিবারের সকলের সুস্থ, সুন্দর, আলোকিত জীবন এবং পরকালীন মুক্তি কামনায় 'মহিলাদের অধীকার বিষয়ক হাদিস' তথ্য-তত্ত্ব সমৃদ্ধ অনবদ্য সংকলন-বইটি কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে রচিত। নিজে সঠিক পথে চলতে এবং অন্যকে সঠিক পথের দিকে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং আল্লহ্‌র সন্তুষ্টি পাওয়ার আশা রেখে উপহার দিলাম।

শুভেচ্ছান্তে ....

সাক্ষর:

আবু হুরায়রা (রাদি.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (ﷺ)বলেন:
"একে অপরকে উপহার দাও এবং একে অপরকে ভালবাস।"
(আল আদাব আল-মাফরাদ ৫৯৪)।

"পৃথিবীতে যা কিছু মহান চির কল্যানকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

সূচিপত্র .....পৃষ্টা

পাঠকের সদয় দৃষ্টি। ৫
সাধারণ জ্ঞান ১. মহিলাদের ইল্‌ম বা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের ফাযীলাত। ৭
সাধারণ জ্ঞান ২. কুরআন পরিচিতি। ৯
সাধারণ জ্ঞান ৩. হাদিস পরিচিতি। ১৪
সাধারণ জ্ঞান ৪. ফিকাহ্‌ পরিচিতি। ১৬
সাধারণ জ্ঞান ৫. সবার প্রশ্নঃ আল্লাহ কোথায় ? ১৭
সাধারণ জ্ঞান ৬. ইসলামের ৩টি প্রধনি মূলনীতি জানা জরুরি। ১৯
সাধারণ জ্ঞান ৭. ইসলামের ৫টি রুকন জানা ও মানা ফরজ। ২১
সাধারণ জ্ঞান ৮. ইমানের ৬টি রুকন জানা ও মানা ফরজ। ২২
সাধারণ জ্ঞান ৯. ইমানের ৯ টি আহ্‌কাম। ২৪
সাধারণ জ্ঞান ১০. ইহ্‌সানের উপর ইমান রাখা ফরজ। ৩০
সাধারণ জ্ঞান ১১. ইমান ভঙ্গের ১০ টি কারন। ৩১
সাধারণ জ্ঞান ১২. মাজহাব ও শিয়া-মতবাদ। ৪৩
সাধারণ জ্ঞান ১৩. সূফিবাদ ও দ্বীন ইসলাম। ৪৮
সাধারণ জ্ঞান ১৪. ইবাদতের প্রতিদান নারী পুরুষে সমান সমান। ৫৩
সাধারণ জ্ঞান ১৫. মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য, নারী পুরুষ সবার জন্য। ৫৪
সাধারণ জ্ঞান ১৬. সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার কর্তব্য। ৫৬
সাধারণ জ্ঞান ১৭. আরবি দিন, চন্দ্র মাস, হিজরি সাল পরিচিতি। ৫৭
১৮. মহিলাদের পবিত্রতা অর্জন বিষয়ের শিক্ষা। ৫৯
১৯. পানি দ্বারা ওযুর পূর্বে মিসওয়াক করার ফাযীলাত। ৬০
২০. পানি দ্বারা ওযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন। ৬০
২১. ফরজ গোসলের পূর্বে ওযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন। ৬০
২২. ফরজ গোসলে পবিত্রতা অর্জনে কুলি ও নাকে পানি দেওয়া। ৬১
২৩. ফরজ গোসলে পবিত্রতা অর্জনে অঙ্গসমূহ পৃথকভাবে ধোয়া। ৬১
২৪. পানির পরিবর্তে মাটি দ্বারা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন। ৬২
২৫. মৃত মহিলার লাশের গোসল মহিলার দ্বারা সম্পন্য কয়া। ৬২
২৬. মহিলাদের 'হায়েয' মাসিক রক্তস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন। ৬৩
২৭. স্ত্রী-পুরুষের কিছু ফিত্বরাত বা স্বভাবসুলভ কাজ আছে। ৬৫
২৮. স্ত্রী-পুরুষের কিছু ফিত্বরাত কাজের মেয়াদ নির্ধরন। ৬৫
২৯. স্ত্রীর নির্ধারিত পথ ছারা ভিন্ন পথে সঙ্গম করা নিশেধ। ৬৫
৩০. হায়েয অবস্থায় সালাত, সিয়াম ও সঙ্গম হতে বিরত থাকা। ৬৬
৩১. হায়েয অবস্থায় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ হতে বিরত থাকা। ৬৬

৩২. মহিলাদের 'নিফাস' সন্তান প্রসবের পর পবিত্রতা অর্জন। ৬৬
৩৩. মহিলাদের জানাবাত (সহবাস) থেকে পবিত্রতা অর্জন। ৬৭
৩৪. মহিলাদের স্বপ্নদোষ থেকে পবিত্রতার অর্জন। ৬৭
৩৫. যাদের সাথে মহিলাদের বিবাহ হারাম। ৬৮
৩৬. স্তনের দুধ পানের সাথে সমপৃক্ত পুরুষের সাথে বিবাহ হারাম। ৬৮
৩৭. মহিলাদের বিবাহে তার সুস্পষ্ট অনুমতি থাকতে হবে। ৬৯
৩৮. এতিম মেয়েকে বিবাহ দেওয়া বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন। ৭০
৩৯.মহিলাদের বিবাহে মোহরানার অধীকার। ৭১
৪০. মোহরানা কম বা বেশী অবশ্যই দিতে হবে এ বিষয়ে হাদিস। ৭২
৪১. মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাকের সঠিক পদ্ধতি। ৭৩
৪২. মহিলাদের তালাকের সুন্নত পদ্ধতি। ৭৪
৪৩. মহিলাদের কেহ তার বোনের তালাকের চেষ্টা করা নিষিদ্ধ। ৭৬
৪৪. মহিলাদের তালাক এবং স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত পালন। ৭৬
৪৫. কন্যা সন্তানদের সাথে মাতা-পিতার সদাচার ও দয়ার ফজিলত। ৭৮
৪৬. কন্যা সন্তানদের সাথে মায়ের স্নেহ ও দয়ার ফজিলত জান্নাত। ৭৮
৪৭. কন্যা সন্তানদের পালনে মাতা-পিতা জাহান্নাম থেকে পরিত্রান পাবে। ৭৯
৪৮. স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা মহিলাদের ইদ্দত ও শোক পালনের বিধান। ৭৯
৪৯. স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করা নিষেধ। ৮০
৫০. মহিলাদের তালাকদাতা স্বামীর সাথে পুনঃবিবাহের বিধান। ৮১
৫১. স্বামী তার তালাকপ্রাপ্তা পূর্ব স্ত্রীকে ফিরিরে নিতে চায় । ৮২
৫২. মহিলাদের গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনীর সিয়াম। ৮২
৫৩. মহিলাদের সন্তানের দুধপান বিষয়ে নিয়ম নিতী। ৮৩
৫৪. সন্তানকে কত দিন দুধ পান করাবে ? সে বিষয়ে আল্লাহর বানী। ৮৪
৫৫. মহিলাদের হিজাব (পর্দা) বিষয়ে বিধান। ৮৪
৫৬. মহিলাদের পোশাক ও সতর ঢাকা সদা-সর্বদা আবশ্যক। ৮৫
৫৭. মহিলাদের গহনার উপর যাকাত দেয়ার আদেশ। ৮৮
৫৮. মহিলাদের বেঁচে থাকার অধিকার। ৮৮
৬৯. মহিলাদের মালিকানা অধিকার-১। ৮৯
৬০. মহিলাদের মালিকানা অধিকার-২। ৯০
৬১. মহিলাদের মালিকানা অধিকার-৩। ৯১
৬২. মহিলাদের মালিকানা অধিকার-৪। ৯১
৬৩. মহিলাদের মালিকানা অধিকার-৫। ৯২
৬৪. মহিলাদের কর্ম ও সমাজিক মর্যাদা ও অধিকার। ৯৩

৬৫. যুবক ও যুবতীর বিয়ে শাদী ও ঘর সংসার করার অধিকার। ৯৪
৬৬. যুবক যুবতীর বহু-বিবাহের অধিকার। ৯৫
৬৭. বিবাহের বিষয়ে অনেক হাদীসের মধ্যে একটি উল্লেখ করা হল: ৯৬
৬৮. ইসলামে একাধিক বিবাহের কিছু কারণ এবং অনুমতি আছে। ৯৭.
৬৯. যার সাথে যার মুহাব্বত তার সাথে তার কিয়ামত। ৯৯
৭০ সৎসঙ্গ স্বর্গ বাস অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ। ১০০
৭১. সাদাকা বা দানের ফাযীলাত যদিও তা এক টুকরা খেজুর হয়। ১০০
৭২. পুণ্যের আশায় পরিবারের জন্য খরচে সাদাকার ফাযীলাত। ১০১
৭৩. স্বীয় পরিবার ও সম্পদকে বদ-দু'আ করা নিশেধ। ১০১
৭৪. কোন মহিলা তার প্রতিবেশী মহিলাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না। ১০১
৭৫. প্রতিদিনের সব দোয়া কবুল হয় না কেন ? ১০২
৭৬. স্বপ্ন ৩ প্রকার, কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে তার কি করনীয়। ১০৩
৭৭. কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্নে দেখলে তার করনীয় হাদিস। ১০৩
৭৮. পাপ মুক্তিতে তওবা ও ইস্তিগফার। ১০৪
৭৯. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইস্তিগফারের হাদিস। ১০৯
৮০. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইস্তিগফারের হাদিস। ১০৯
৮১. সায়্যিদুল ইস্তিগফারের হাদিস। ১১০
৮২. যে কোন বৈঠক শেষে দু'আ। ১১০

আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রসংশা এবং তাঁর কৃপায় সংকলকের প্রকাশিত বইসমূহ-
১.কুরআনুল কারিমের শুধু বাংলা অনুবাদ আবু-ধাবী থেকে প্রকাশিত।
২.কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশুদ্ধ ইমান ও আকিদা-ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
৩.মহিলাদের অধীকার বিষয়ক হাদিস-ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
৪.শিক্ষানবীশদের বিষয় ভিত্তিক হাদিস-ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
৫.ব্যবসায়ীদের বিষয় ভিত্তিক হাদিস-ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
৬.অন লাইনে বইগুলি পড়তে ও কপি করতে পারবেন নিচের সাইটে:
https://leanpub.com/purified-eman-and-aqeeda

উচ্চারন- লা তাজলামুন ওয়ালা তুজলামুন لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ....
"তোমরা কাউকে অত্যাচার করবে না এবং তোমাদেরকেও অত্যাচার করবে না।"
(সূরা বাকারা ২:২৭৯ শেষ অংশ)

পাঠিকা-পাঠকগণের সদয় দৃষ্টি।

মুসলিম মহিলাদের সাথে পুরুষদের আচার-আচরণ, চাওয়া-পাওয়া, কর্তব্য-অধিকার, দৈহিক-সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ নিষেধ ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রচার করার উদ্দেশ্যে 'মহিলাদের অধিকার বিষয়ক হাদিস' শিরোনামে এই ছোট বইটি লেখা। প্রত্যেকটি হাদীসের পিছনে কারণ থাকে। কিছু কারণ হাদীসের বর্ণনার মধ্যেই পাওয়া যায়। কিছু কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা। সব বিষয়ে কুরআনের আয়াত রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর হাদিস এবং শেষে ইমাম ও আলেমগনের বিশ্লেষন দেয়া হয়েছে। শিক্ষা ও বিশ্বাস পুরুষ মহিলা সবার জন্য যা কুরআন ও হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের চলার জন্য র্নিদিষ্ট পথ ও পথনির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন: "অবশ্যই মানুষের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে কোন স্মরণীয় কিছুই ছিল না। নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু হতে, যাতে আমি তাকে পরীক্ষা করি; এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। নিশ্চয় আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ হবে।"(সূরা দাহ্র ৭৬:১-৩)।

মানুষই তার জন্মের পূর্বে স্মরণ করার মত উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না, কেহ তাকে চিন্ত না। অতপর আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে জ্ঞান দান করেছেন। এসব ইন্দ্রীয়ের নিয়ন্ত্রন ক্ষমতাও মানুষের অধীন, যার ফলে ভাল মন্দ উভয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম। এরপর তার সুস্থ সুন্দর জীবন যাপনের জন্য কুরআনকে দলিলরুপে এবং রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে আদর্শ হিসাবে প্রেরণ করেছেন। সঠিক পথনির্দেশ সহকারে সবাইকে ভাল ও মন্দ বোঝার শক্তিও দেয়া হছেন। সে ভালোটি গ্রহণ করে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ হতে পারে বা পরিত্যাগ করে অকৃতজ্ঞ হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আত্মার বেচা কেনা করে। হয় সে তাকে ধবংস ক'রে দেয়, অথবা মুক্ত ক'রে নেয়।"(হাদিস মুসলিম)।

আমরা পারতপক্ষে এক সেট সহীহ্ হাদীসের বাংলা অনুবাদ ক্রয় করে সরাসরি মায়ের ভাষায় দ্বীনের অনুশীলন করার চেষ্টা করি। সৎ ও বিজ্ঞ আলেম থেকে দ্বীন ইসলাম সঠিকভাবে শিক্ষে আমল করি ও জান্নাত পাওয়ার চেষ্টা করি।

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুর রউফ বিন ইয়াকিন।

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির্‌ রাহীম।

সাধারণ জ্ঞান ১. মহিলাদের ইল্‌ম বা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের ফাযীলাত।

জ্ঞান অর্জনের প্রধান মাধ্যম দু'টি, চোখে দেখা এবং কানে শুনা। অক্ষরের জ্ঞান থাকলে অক্ষরে লেখা দেখে পড়বে, অক্ষরের জ্ঞান না থাকলে কানে শুনে পড়বে (পড়বে অর্থ অন্তরে বা মুখে উচ্চারণ করবে)। শিশুর অক্ষরের জ্ঞান না থাকায় এবং অন্ধলোক দেখতে না পারায়, তারা শুনে শুনে জ্ঞান অর্জন করে। শিশুগণ মায়ের ভাষা শুনে ভাষার জ্ঞান অর্জন করে; তাই মাতৃভাষা বলা হয়, যা মহিলাদের প্রথম কৃতিত্ব। প্রত্যেক মুসলিমের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ধর্মীয় ও তৃতীয় পেশাগত জ্ঞান। ধর্মীয় জ্ঞানের প্রথম শর্ত আল্লাহ্‌র উপর ইমান আনা, মুহাম্মদ (ﷺ)-কে রাসুল হিসাবে মেনে নেয়া **এবং মুখে তাওহিদের বানী উচ্চারন করা** لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ "আল্লাহ ব্যাতীত কোন (সত্য) ইলাহ্‌ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহ্‌র রাসূল।" ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন, ইমান ও সহীহ আকিদার প্রধান উৎসগুলি নিম্নরুপ:

১ম.উৎস: **আল্লাহ্‌র** বানী আরবি ভাষায় অবতীর্ণ আল-কুরআন। আরবি ভাষা অধ্যায়ন করে কুরআনের তেলাওয়াত এবং আদেশ-নিশেধ জানা এবং সেই অনুসারে আমল করার বিনিময় জান্নাত। আরবি ভাষার পন্ডিত না হলেও কমপক্ষে তেলাওয়াত অবশ্যই শিখতে হবে। তেলাওয়াত ছারা সালাত হবে না, দু'আ কালাম আরবিতেই পড়তে হয়। সহীহ্‌ আলেম থেকে কুরআন ও হাদিসের বাংলা অনুবাদ পড়ে বা শুনে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সেই অনুযায় আমল করাই মুসলিমের কাজ। মূর্খ সুফিদের প্রচলিত তরিকা, জিকির ও আচার অনুষ্ঠান সময় ও টাকার অপচয় মাত্র। ধর্ম নিয়ে ব্যবসায়ীদের ধোকা থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

২য়.উৎস: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহীহ্‌-হাদীস ও সাহাবাদের কথা ও আমল। কুরআন থেকে **ধর্মীয় জ্ঞান** অর্জন করা এবং আদর্শ হিসাবে সহীহ্‌-হাদিসের অনুস্বরণ করে আমল করলে মুসলিম ও মুমিন হিসাবে জান্নাত আশা করা যায়।

৩য়.উৎস: কুরআন-হাদীসের অনুসরণে সাহাবাদের ঐক্যমত ও আমলই ইজমা। সাহাবাদের সময় থেকেই ঐক্য শেষ হয়ে গেছে। যেমন: ৫ ওয়াক্ত সালাত, রমাজান মাসে সিয়াম সহ বিভিন্ন আমলসমুহ।

৪র্থ. উৎস: সাহাবাদের আমল, ইজমা ও সালফে সালেহীনদের অনুসারে কিয়াস। যা চলমান আছে এবং ধর্মীয় সমস্যা সমাধানে ফিকাহ্ চলমান থাকবে। **হাদীস থেকে ধর্মীয় জ্ঞান** অর্জনের ফাযীলাত উল্লেখ করা হলো।

ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম-

প্রথম ভাষা নির্ধারন: ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থগুলি আরবি ভাষায়। ভাষান্তর করে মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে যা অনেকটা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় শিক্ষক নির্ধারন: মাতা-পিতা যতটা জানে ততটা নিজেরাই শিক্ষা দিবে অথবা গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিবে। তৃতীয় প্রতিষ্ঠান নির্ধারন: মাসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা, মাদরাসা বা স্কুলের শ্রেনী ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। মসজিদের খোতবা, ইসলামী জালছা, ওয়াজ মাহফিল, মহল্লা ও গ্রামে তালিম ইত্যদি। তবে সাবধান থাকতে হবে অজান্তে কোন দলের সদস্য হয়ে জান কিন।

আল্লাহ যার খায়ের চান তাকে দ্বীনের প্রজ্ঞা দান করেন।

"ইবনু আব্বাস (রাদি.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: **আল্লাহ্ যার খায়ের বা কল্যান চান, তাকে ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন।**" (তিরমিযি ২৬৪৫, তাহকিক সুনান ইবনূ মা'জা তা.পা. ২২০, বুখারী ও মুসলিম)।

দীনের ইলম তালাশে জান্নাতের পথ সহজ হয়।

"মাহমুদ ইবনে গায়লান (রহ.) . . . হতে আবু হুরায়রা (রাদি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি ইল্ম তালাশ করতে পথ চলে আল্লাহ্ তাঁর জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন।" (তিরমিযি, হাদীস ২৬৪৬, তাহকিক সুনান ইবনূ মা'জা তা.পা. ২২৬, মুসলিম)।

মদীনার আলিম অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী আর পাবে না।

"হাসান ইবনে সাব্বাহ আল বায্যার ও ইসহাক ইবনে মুসা আনসারী (রহ.). . . আবু হুরায়রা (রাদি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: অচিরেই লোকেরা ইলম তালাশে তাদের উটের উপর চড়ে সফর করবে। কিন্তু তারা মদীনার আলিম অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী আর কাউকে পাবে না।" (অধ্যায়-৩৯: জ্ঞান, অনুচ্ছেদ: ১৮, তিরমিযি,হাদীস ২৬৮০,২৬৮৯)।

মুমিন ভাল কথা শোনা থেকে পরিতৃপ্ত হয় না।

"উমর ইবনে শায়বাণী বাসরী (রহ.). . . আবু সাইদ আল-খুদরী (রাদি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: মুমিন জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত কখনও কোন ভাল কথা শোনা থেকে পরিতৃপ্ত হয় না।" (তিরমিযি, হাদীস নং-২৬৮৬)।

সাধারণ জ্ঞান ২. কুরআন পরিচিতি।

কুরআন কী ?

কুরআন হচ্ছ আল্লাহ্‌র কালাম বা বানী, 'ওহী মাতলু' অর্থাৎ যে ওহী নিয়মিত তেলাওয়াত করা হয়। কুরআন মুসলিমগণ বিশ্বাস করে এবং অনূসরণ করে। মুহাম্মদ (ﷺ)-কে ওহীর মাধ্যমে তাঁর কলবে এই কুরআন হেফাযত বা সংরক্ষণ করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইহা নিয়মিত তেলাওয়াত করে শুনাতেন। তেলাওয়াত শুনে এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সাহাবাগণ লিখে রাখতেন। অনেক সাহাবীকে 'কাতিবে ওহী' অর্থাৎ ওহী লেখক বলা হয়। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে ঐ তেলাওয়াত শুনে কুরআন মুখস্ত করেছিলেন। ১১৪ টি সুরা ও ৬ হাজারের বেশী আয়াত নিয়ে একত্রে পূর্ণ কুরআন। ৩য় খলীফা ওসমান (রাদি.) (২৪হি.-৩৬হি.) সময়ে বই আকারে প্রকাশ করা হয়। সেই কুরআন আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে। বিশ্বের কোটি কোটি মুসলিম পূর্ণ কুরআন তাদের কলবে হেফাজত করে রেখেছেন। তাদেরকে 'হাফেযে কুরআন' বা শুধু 'হাফেয' বলা হয়। কুরআন হচ্ছে দ্বীন ইসলামের ইমান-আকিদা শিক্ষা ও আমলের প্রথম, প্রধান ও মূল উৎস ।

সুতরাং প্রত্যেক নারী পুরুষকে কুরআন শিখতেই হবে। যারা কুরআন তেলাওয়াত শিখবে, অর্থ জানবে, এবং আমল করবে কুরআন কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সুপারিশ করবে, যার মাধ্যমে জান্নাতের আশা করা যায়। কুরআন ছাড়া ইসলাম ও ইমান পূর্ণ হবে না। সালাত হবে না, কবরের প্রশ্নের উত্তর হবে না। কবরে মুমিন ব্যক্তি ৩টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে তাকে ৪র্থ প্রশ্ন করা হবে: তুমি কিরূপে জেনেছ? সে উত্তরে বলবে, আমি কুরআন শুনেছি, পড়েছি ও এর উপর ইমান এনেছি ও সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। (তফসির ইব্‌ন কাছির সুরা ইবরাহিম ১৪:২৭, সহীহ্ আত-তিরমিযী হাদিস নং-৩১২০)।

এবার চিন্তা করুন কুরআনের অনুবাদ পড়বেন কিনা ?

কুরআনে আছে- (১) আল্লাহ্ স্বত্তাগত পরিচয় ও গুনাবলির বর্ণনা। (২) আল্লাহ্ সৃষ্টি জগতসমুহ, মানুষ ও জিন জাতি সৃষ্টির তথ্য। (৩) নবী-রাসূলগণ এবং তাদের উপর নাজিলকৃত আসমানি কিতাবের বর্ণনা। (৪) পূর্ববর্তী কিছু জাতীর ধবংসের কারণ ও বিবরণ। (৫) অবাধ্য কাফিরদের কুফরির শাস্তি ও পরিণতির বিবরণ। (৬) হালাল ও হারাম বিষয়ের বর্ণনা। (৭) বিধি-বিধান, আদেশ-নিশেধ সংক্রান্ত বিবরণ। (৮) শাস্তি ও সতর্ককরণ বিষয়ে আলোচনা। (৯) ইবাদত, আমল, উপদেশ ও সুসংবাদ সম্পর্কে বিবরণ। (১০) ইমান ও আকিদা সংক্রান্ত বিবরণ। (১১) আখিরাত সংক্রান্ত

বিষয়সমূহ, কবর, কিয়ামত, হাশর, মিজান, পুল সিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ। আরও অনেক কিছু . . . .

কুরআন সন্মন্ধে সন্দেহ পোষণ করা কুফরী।

কেহ যদি কুরআন সন্মন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, এর আদেশ নিশেধ মানবে কি মানবে না দোদুল্যমান হয়; তার জন্য দুনিয়া আখিরাতে দুর্ভোগ। এবিষয়ে হাদিস "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: কুরআন সন্মন্ধে সন্দেহ পোষণ কুফরী।" (আবু দাউদ হাদিস নং-৪৬০৩, আহম্মদ হাদিস নং-৪৬০২)।

কুরআনের ১১৪ টি সূরার নাম।

১. সূরা আল-ফাতিহা: (ভূমিকা বা উদঘাটিকা), ৭ আয়াত।
২. সূরা আল-বাক্কারাহ্: (গাভিটি), ২৮৬ আয়াত।
৩. সূরা আলে-ইমরান: (ইমরানের বংশধর), ২০০ আয়াত।
৪. সূরা আল-নিসা: (মহিলাগণ), ১৭৬ আয়াত।
৫. সূরা আল-মায়েদা: (খাবার ভর্তি খাণচা বা অন্নপাত্র), ১২০ আয়াত।
৬. সূরা আনআম: (চতুস্পদ জন্তু), ১৬৫ আয়াত।
৭. সূরা আল-আ'রাফ: (জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের স্থান), ২০৬ আ:
৮. সূরা আনফাল: (গনিমতের মাল), ৭৫ আয়াত।
৯. সূরা আত-তাওবাহ্: (পাপ থেকে ফিরে আশা), ১২৯ আয়াত।
১০. সূরা ইউনুস: (একজন নবীর নাম), ১০৯ আয়াত।
১১. সূরা হুদ: (একজন নবীর নাম), ১২৩ আয়াত।
১২. সূরা ইউসুফ: (একজন নবীর নাম), ১১১ আয়াত।
১৩. সূরা রা'দ: (বিদ্যুৎ চমকান বা বজ্রধ্বনি), ৪৩ আয়াত।
১৪. সূরা ইব্রাহীম: (একজন নবীর নাম), ৫২ আয়াত।
১৫. সূরা হিজর: (হিজরবাসী, আল-ওলার সামুদ সম্প্রদায়), ৯৯ আ:
১৬. সূরা নাহল: (মধুমক্ষিকা বা মৌমাছি), ১২৮ আয়াত।
১৭. সূরা বনী ইসরাইল বা সূরা ইস্রাহ্: (ইসরাইলের বংশধর), ১১১ আয়াত।
১৮. সূরা কাহ্ফ: (গুহা বাসী), ১১০ আয়াত।
১৯. সূরা মারইয়াম: (নবী ঈসা আ:-এর মাতা), ৯৮ আয়াত।
২০. সূরা ত্বা-হা: (বিছিন্য আরবি বর্ণদয়), ১৩৫ আয়াত।
২১. সূরা আম্বিয়া: (নবী-রাসূলগণ), ১১২ আয়াত।
২২. সূরা হাজ্জ: (হাজ্ব, ইসলামের ১টি রুকন), ৭৮ আয়াত।
২৩. সূরা আল-মু'মিনুন: (মু'মিনগণ অথৎি বিশ্বাসীগণ), ১১৮ আয়াত।

২৪. সূরা আন-নুর: (জ্যোতি), ৬৪ আয়াত।
২৫. সূরা আল-ফুরকান: (পার্থক্যকারী), ৭৭ আয়াত।
২৬. সুরা আশ-শু'আরা: (কবিগণ), ২২৭ আয়াত।
২৭. সুরা আন-নামল: (পিপড়া বা পিপীলিকা), ৯৩ আয়াত।
২৮. সুরা আল কাসাস: (অতীতের ঘটনাবলী), ৮৮ আয়াত।
২৯. সুরা আল-আনকবুত: (মাকরসা), ৬৯ আয়াত।
৩০. সুরা আর-রূম: (রোম সম্রাজ্য), ৬০ আয়াত।
৩১. সুরা লোকমান: (আল্লাহর প্রিয় এক ব্যক্তির নাম), ৩৪ আয়াত।
৩২. সুরা সাজদাহ: (আল্লাহ্কে সেজদা করা), ৩০ আয়াত।
৩৩. সুরা আল-আহযাব: (দল সমূহ), ৭৩ আয়াত।
৩৪. সুরা সাবা: (ইয়ামেনের একটি এলাকার নাম), ৫৪ আয়াত।
৩৫. সুরা ফাতির: (প্রথম সৃষ্টিকর্তা বা একমাত্র আল্লাহ), ৪৫ আয়াত।
৩৬. সুরা ইয়াসীন: (আরবি বিছিন্য বর্ণ), ৮৩ আয়াত।
৩৭. সুরা আস-সাফফাত: (সারিসমূহ বা কাতার বা লাইন), ১৮২ আয়াত।
৩৮. সুরা ছোয়াদ: (আরবি বিছিন্য বর্ণ), ৮৮ আয়াত।
৩৯. সুরা আয-যুমার: (মানুষের দলসমূহ), ৭৫ আয়াত।
৪০. সুরা আল-মু'মিন: (একজন মু'মিন, বিশ্বাসী-একবচন), ৮৫ আয়াত।
৪১. সুরা হা-মীম সিজদাহ বা সুরা ফুস্সিলাত: (বিছিন্য বর্ণ), ৫৪ আয়াত।
৪২. সুরা আশ-শূরা: (উপদেষ্টামণ্ডলী), ৫৩ আয়াত।
৪৩. সুরা আয-যুখরুফ: (সজ্জিত করা), ৮৯ আয়াত।
৪৪. সুরা আদ-দুখান: (ধোঁয়া), ৫৯ আয়াত।
৪৫. সুরা আল-জাসিয়া: (নতজানু), ৩৭ আয়াত।
৪৬. সুরা আল-আহকাফ: (বালুর উঁচু স্তর বা পাহাড়), ৩৫ আয়াত।
৪৭. সুরা মুহাম্মদ:) শেষ নবী (ﷺ)-এর নাম ,(৩৮ আয়াত।
৪৮. সুরা ফাতাহ্: (বিজয়), ২৯ আয়াত।
৪৯. সুরা হুজরাত: (কক্ষসমূহ), ১৮ আয়াত।
৫০. সুরা কাফ্: (আরবি বিছিন্য বর্ণ), ৪৫ আয়াত।
৫১. সুরা আয-যারিয়াত: (বায়ু প্রবাহ), ৬০ আয়াত।
৫২. সুরা আত্-তূর: (তূর পর্বতটি, সুরিয়াতে অবস্থিত), ৪৯ আয়াত।
৫৩. সুরা আন-নাজম: (আকাশের তারা), ৬২ আয়াত।
৫৪. সুরা আল-কামার: (আকাশের চাঁদ), ৫৫ আয়াত।
৫৫. সুরা আর্-রহমান: (দয়াময়), ৭৮ আয়াত।
৫৬. সুরা আল-ওয়াকিয়া: (ঘটনাটি), ৯৬ আয়াত।

৫৭. সুরা আল-হাদীদ:) লোহা বা লৌহ ,(২৯ আয়াত।
৫৮. সুরা আল-মুজাদালা: (বাগ-বিতন্ড), ২২ আয়াত।
৫৯. সুরা আল-হাশর: (শেষ বিচারের দিন), ২৪ আয়াত।
৬০. সুরা আল-মুমতাহিনা: (পরীক্ষা বা নিরীক্ষা করা), ১৩ আয়াত।
৬১. সুরা আছ-ছাফ: (কাতার সমূহ বা সারি সমূহ), ১৪ আয়াত।
৬২. সুরা আল-জুমুয়া: (জুমার দিন), ১১ আয়াত।
৬৩. সুরা মুনাফিকুন: (মুনাফিক), ১১ আয়াত।
৬৪. সুরা আত-তাগাবুন: (হার-জিত বা ক্ষতি-লাভ), ১৮ আয়াত।
৬৫. সুরা আত-তালাক:) বর্জন করা, স্ত্রী তালাক দেওয়া ,(১২ আয়াত।
৬৬. সুরা আত-তাহরীম: (হারাম বা অবৈধ করে নেওয়া), ১২ আয়াত।
৬৭. সুরা আল-মুল্ক: (রাজত্ব), ৩০ আয়াত।
৬৮. সুরা আল-কলম: (কলম, লিখনী), ৫২ আয়াত।
৬৯. সুরা আল-হাক্কাহ: (সত্যটি, কিয়ামতের একটি নাম), ৫২ আয়াত।
৭০. সুরা আল-মাআরিজ: (সম্মান বৃদ্ধি, সিঁড়ি), ৪৪ আয়াত।
৭১. সুরা নূহ:) একজন নবীর নাম ,(২৮ আয়াত।
৭২. সুরা আল-জ্বিন:) জ্বিন জাতি ,(২৮ আয়াত।
৭৩. সুরা আল-মুজ্জাম্মিল: (চাদর আবৃত), ২০ আয়াত।
৭৪. সুরা আল-মুদ্দাস্সির: (বস্ত্র আবৃত), ৫৬ আয়াত।
৭৫. সুরা আল-কিয়ামাহ্: (শেষ বিচার দিবসে দাঁড়ান), ৪০ আয়াত।
৭৬. সুরা আদ-দাহ্র বা ইনসান: (যুগ, সময়, মানব জাতি), ৩১ আয়াত।
৭৭. সুরা আল-মুরসালাত: (চলমান বায়ু), ৫০ আয়াত।
৭৮. সুরা আন-নাবা: (সংবাদ), ৪০ আয়াত।
৭৯. সুরা আন-নাযিয়াত: (মালিকুল মাউত কর্তৃক রুহ বের করা), ৪৬ আয়াত।
৮০. সুরা আবাসা: (মুখ ফিরিয়ে নেয়া), ৪২ আয়াত।
৮১. সুরা আত-তাকভীর: (সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া), ২৯ আয়াত।
৮২. সুরা আল-ইনফিতার: (আসমান বিদীর্ণ হওয়া), ১৯ আয়াত।
৮৩. সুরা আল-মুতাফফিফীন: (প্রতারক), ৩৬ আয়াত।
৮৪. সুরা আল-ইনশিকাক: (আসমান ভেঙ্গে যাওয়া), ২৫ আয়াত।
৮৫. সুরা আল-বুরুজ: (আসমানের তারকা), ২২ আয়াত।
৮৬ সুরা আত-তারিক্ক:) রাত্রে আগমনকারী ,(১৭ আয়াত।
৮৭. সুরা আল-আ'লা: (সর্বোচ্চ বা উন্নত), ১৯ আয়াত।
৮৮. সুরা আল-গাশিয়া: (ঢেকে রাখা বা কিয়ামতরে নাম), ২৬ আয়াত।
৮৯. সুরা আল-ফজর: (ফজরের সময়), ৩০ আয়াত।

৯০. সুরা আল-বালাদ: (দেশ বা শহর), ২০ আয়াত।
৯১. সুরা আশ-শামস: (সূর্য), ১৫ আয়াত।
৯২. সুরা আল-লাইল: (রাত, রাত্রিকাল), ২১ আয়াত।
৯৩. সুরা আদ-দ্বোহা: (সকাল বেলা), ১১ আয়াত।
৯৪. সুরা আল-নাশরাহ: (উন্মুক্ত করন বা খোলামেলা), ৮ আয়াত।
৯৫. সুরা আত-ত্বীন: (তীন ফল বা আঞ্জির ফল), ৮ আয়াত।
৯৬. সুরা আলাক: (জমাট রক্ত), ১৯ আয়াত।
৯৭. সুরা কদর: (সম্মানীত), ৫ আয়াত। সুরা
৯৮. সুরা বায়্যিনা: (দলিল, প্রমাণ), ৮ আয়াত।
৯৯. সুরা যিলযাল: (ভূমিকম্প), ৮ আয়াত।
১০০. সুরাআদিয়াত: (দ্রুতগামী ঘোড়া বা অশ্ব।), ১১ আয়াত।
১০১. সুরা কারিআ: (মহা-প্রলয় বা কিয়ামতরে অপর নাম), ১১ আয়াত।
১০২. সুরা তাকাছুর:) প্রাচুর্য বা বেশী পাওয়ার নেশা ,(৮ আয়াত।
১০৩. সুরা আছর: (আছরের সময় বা কাল), ৩ আয়াত।
১০৪. সুরা হুমাযা: (চোগলখোর বা পরনিন্দাকারী), ৯ আয়াত।
১০৫. সুরা ফীল: (হাতী বা হস্তী), ৫ আয়াত।
১০৬. সুরা কুরাইশ: (কুরাইশগোত্র), ৪ আয়াত।
১০৭. সুরা মাউন: (সাহায্য বা সহায়তা), ৭ আয়াত।
১০৮. সুরা কাওছার: (অফুরান্ত শরবতের নহর), ৩ আয়াত।
১০৯. সুরা কাফিরুন: (কাফেরগণ বা অবিশ্বাসীগোষ্ঠী), ৬ আয়াত।
১১০. সুরা আন-নছর: (আল্লাহ্‌র সাহায্য), ৩ আয়াত।
১১১. সুরা লাহাব: (জ্বলন্ত অঙ্গার), ৫ আয়াত।
১১২. সুরা ইখলাস: (আল্লাহ্‌র একত্ব), ৪ আয়াত।
১১৩. সুরা ফালাক: (নিশিভোর), ৫ আয়াত।
১১৪. সুরা নাস: (মানুষ জাতি), ৬ আয়াত।

কুরআন শিক্ষা ও অন্যকে শিক্ষা দেয়ার ফজিলত।

"উসমান ইব্‌নু আফফান (রাদি.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।" (সহীহুল বুখারী তা.পা. ৫০২৭, ৫০২৮, আ:প্র. ৪৬৫৩, ৪৬৫৪, ই.ফা. ৪৬৫৭, ৪৬৫৮)।

কুরআন আল-করিমে ১১৪ টি সূরার নাম বাংলা অর্থ পড়লে দেখা যায় প্রতিটি নাম পরিচিত জিনিসের নামের সাথে মিল আছে এবং সহজেই বোধগম্য। নাম গুলো বার

বার পড়লে সহজে সূরার নাম মনে রাখা সম্ভব। পরিবারের সবাই এগুলো স্মরণ রাখার চেষ্টা করি। ছোট্ট শিশুটিকে 'হাট্টিমা-টিম, মিথ্যা ঘোড়ার ডিম'; না শিখায়ে। সূরার নাম এবং ইসলামিক পরিভাষার শব্দ শিক্ষা দেওয়া উত্তম নয় কি?

সাধারণ জ্ঞান ৩. হাদিস পরিচিতি।

হাদিস কী?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কর্ম, আদেশ, নিষেধ, আনুমোদন এবং কর্মপদ্ধতির বর্ণনা এবং কুরআনের ব্যাখ্যাই হাদিস। হাদিস হল 'ওহী গায়ের-মাতলু' অর্থাৎ যে ওহী নিয়মিত তেলাওয়াত করা হয় না বটে, তবে প্রতিটি মুসলিম হাদিসকে বিশ্বাস করে ও অনূসরণ করে। মানুষের জন্য প্রয়োজন আদর্শ ও নমুনা। স্বভাবগতভাবে মানুষ অনুকরণপ্রিয় এবং তার প্রয়োজনও আছে। আল্লাহ্ সেই নমুনা বানিয়েছেন শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে। তাঁর জীবন ও কর্ম, শিক্ষা ও আদর্শ মানবজাতির জন্য আসমানী নমুনা। যার অনুসরণ-অনুকরণের মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের মুক্তি ও সাফল্য রয়েছে। আর তাঁর লক্ষ লক্ষ সাহাবাগণ এই অনুকরণের কাজটিই করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কলবে আল্লাহ্ কুরআন ও হাদিস সবকিছু সংস্থাপিত করেছিলেন। বিভিন্ন প্রয়োজনে তিনি সাহাবাদের শিক্ষা দিতেন। কোনটি কুরআন এবং কোনটি হাদিস তাও বুঝিয়ে দিতেন। কুরআন এবং হাদিস দু'টিই আল্লাহর নাযিলকৃত 'ওহী' বা বানী।' অনেকেই হাদিসকে তাদের কলবে হেফাজত করেছেন। তবে তাদেরকে 'হাফেয' না বলে 'মুহাদ্দিস' বলা হয়। হাদিস হচ্ছে দ্বীন ইসলামের ইমান-আকিদা ও আমলের দ্বিতীয় মূল উৎস। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সহীহ হাদীসের আদেশ নিষেধে পালন ও অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ ও তথ্য-প্রমানগুলি কুরআনুল কারিমের অনেক আয়াতে রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদিস সম্পর্কে আল্লাহ্র বানী-(১)

"আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এ কুরআন ওহী ছাড়া অন্য কিছু নয়।" (সূরা নাজম ৫৩:৩-৪)।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ))-এর হাদিস সম্পর্কে আল্লাহ্র বানী-(২)

".....আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। আর ভয় কর আল্লাহ্কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।" (সূরা হাশর ৫৯:৭ আয়াতের অংশ)।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ))-এর হাদিস সম্পর্কে আল্লাহ্র বানী-(৩)

"কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তার রাসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন সে কাজে তাদের কোন নিজস্ব সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।" (সূরা আহযাব ৩৩: ৩৬)।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ))-এর হাদিস সম্পর্কে আল্লাহর বানী-(৪)

"কিন্তু কেবল আল্লাহর তরফ থেকে পৌঁছানো, তাঁর বানী প্রচার করাই আমার কাজ। আর যে ব্যক্তি অমান্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে, তাঁর জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।" (সূরা জ্বিন ৭২:২৩)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ))-এর হাদিস সম্পর্কে আল্লাহ্‌র আরও অনেক বানী আছে ....

হাদিসের কিতাব বা বইয়ের তালিকা:

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কর্ম, আদেশ, নিষেধ, আনুমোদন এবং কর্মপদ্ধতির বর্ণনা এবং কুরআনের ব্যাখ্যাই হাদিস। এসব তথ্যগুলি যারা সংগ্রহ ও লিখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন, তাদের নাম অনুসারে হাদিস বইগুলি লিখিত ও সংকলিত হয়েছে। কুরআনের অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে কর্ম ও কর্মপদ্ধতি পালন করতে এই হাদিস বইগুলি সহায়ক। প্রামান সহকারে সংগৃহিত ৬টি হাদিস বইকে সিহা সিত্তাহ (The Authentic Six) বলা হয়। শুরু থেকেই হাদিসের বইগুলি আরবি ভাষায় লিখিত ও সংকলিত হয়েছে। পরে ভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। হাদিসের বাংলা অনুবাদের অনেক বই আছে যার কিছু নাম নিচে দেয়া হল।

১. সহীহ আল-বুখারী সংগ্রহে ইমাম বুখারী। জন্ম- মৃত্যু (১৯৪-২৫৬) হি.
২. সহীহ মুসলিম সংগ্রহে ইমাম মুসলিম। জন্ম-মৃত্যু (২০৪-২৬১) হি.
৩. সুনান আবূ দাউদ সংগ্রহে ইমাম আবুদাউদ। জন্ম-মৃত্যু (২০২-২৭৫) হি.
৪. সুনান ইবনে মাজাহ সংগ্রহে ইমাম ইবনে মাজাহ। জন্ম-মৃত্যু (২০৯-২৭৩) হি.
৫. সুনানু নাসাঈ হাদিস সংগ্রহে ইমাম ইবনে নাসাঈ। জন্ম-মৃত্যু (২১৪-৩০৩) হি.
৬. সহীহ তিরমিযী সংগ্রহে ইমাম তিরমিযী। জন্ম-মৃত্যু (২০৯-২৭৯) হি.
৭. মুয়াত্তা মালিক সংকলনে ইমাম মালিক ইবনে আনাস। জন্ম-মৃত্যু(৯৩-১৭৯)হি.
৮. মুসনাদে আহমাদ সংকলনে ইমাম ইবনে হাম্বল। জন্ম-মৃত্যু (১৬৪-২৪১) হি.
৯. সূনান আল দারেমী হাদিস সংগ্রহে আল-দারেমী। মৃত্যু (২৫৫) হি.
১০. সুনান আদ-দারা কুতনী সংগ্রহে দারা কুতনী। মৃত্যু (৩৮৫) হি.
১১. সহীহ ইবনে খুযায়মা সংগ্রহে মুহাম্মদ ইসহাক। জন্ম-মৃত্যু (৩০৬-৩৮৫)হি.
১২. সহীহ আবু আউয়াল সংগ্রহে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক। মৃত্যু (৩১১) হি.
১৩. সহীহ ইবনে হিব্বান সংগ্রহে আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান।(৩৫৪) হি.
১৪. তাহক্কীক রিয়াযূস স্ব-লিহীন-আরব দেশের ফাজায়েলে আমল।(৬৩১-৬৭৬) হি.

১৫. 'বুলুগুল মারাম' সালাত ও অন্যান্য মাসলার হাদিস। জন্ম-মৃত্যু (৭৭৩-৮৫২) হি.
(বি: দ্র: হিজরি ও খৃষ্টাব্দ কিছু কম বেশী হতে পারে। কারণ হিজরি বা চন্দ্র বৎসর হয় ৩৫৬ দিন ৬ ঘন্টা। সূর্য বৎসর হয় ৩৬৫ দিন ৪ ঘন্টা।)

সাধারণ জ্ঞান ৪. ফিকাহ্ পরিচিতি।

ফিকাহ্ কী ?

ফিকাহ্ হল হাদীসের ব্যাখ্যা। কুরআন ও হাদিস দু'টিই আল্লাহর নাযিলকৃত ওহী। সাধারণ মানুষের ইবাদত ও আমল করার জন্য কিছু তথ্য একই স্থানে পাওয়া যায় না। এর সমাধানে আলেমগণ, যারা কুরআন ও হাদিসে বিজ্ঞ তাদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষন এবং মতামতকেই 'ফিকাহ্' বলে। ফিকহ্ اَلْفِقْهُ অর্থ- ইসলাম স্বীকৃত বিধি-বিধানের বুঝ ও উপলব্ধির সমষ্টি। সহজ ভাষায় বলা যায়, যে বিষয়ে অধ্যয়ন করলে কুরআন ও হাদিসের দলিল প্রমানের ভিত্তিতে শরিয়তের বিধি-বিধান সঠিক ও স্পষ্টভাবে জানতে পারা যায়, তাকে ইল্‌মে ফিকাহ্ বলে। আলেমদের ইল্‌মের উৎস ও জ্ঞানের পরিধি অনুসারে হাদীসের ব্যাখ্যায় কিছু ভিন্নতা দেখা যায়। আর ভিন্নতার কারণেই পরবর্তিতে মাযহাবের সৃষ্টি হয়। তবে মূল ইবাদত ও আমলে কোন পার্থক্য নেই। পরিপূর্ণ হেদায়েত পেতে হলে অবশ্যই অর্থসহ কুরআন ও হাদীসের সঠিক অনুবাদ পড়তে হবে এবং বিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ আলেম থেকে ফিকাহ্ বা ব্যাখ্যা নিতে হবে। কিছু পণ্ডিত লোক সহীহ হাদীসের বিরোধিতা করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হাদীসের গলা কেটে তা অকার্যকর করার চেষ্টা করেন। তারা কিছু বইতে হাদিস উল্লেখ থাকেন বটে তবে নিজের মনমত ব্যাখ্যা দিয়ে আসল উদ্দেশ্য অকার্যকর করার চেষ্টা করেন। হাদীসের শেষে টিকা সংযুক্ত করে লেখা হয়; আমাদের তরিকায় নেই, আমাদের নীতিতে নেই ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসের সামনে জ্ঞান, বিজ্ঞান, তরীকা, মাযহাবের দোহাই দিয়ে হাদিস পালনে বাধা দান করার পরিণাম কুরআনে উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকেই জেনে সতর্ক হতে হবে। বোঝা, দেখা ও শুনার শক্তি সবার জন্য সমান নয়; অনেকেই ফিকাহ্ সঠিকভাবে বোঝেন না। এমন সব বিষয়ে আল্লাহ্‌র সতর্ক বানী: "আর আমি সৃষ্টি করেছি এমন অনেক জিন ও মানুষ যাদের 'কলব' (অন্তর) আছে বটে, কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। তারাই গাফেল-উদাসীন।" (সূরা আল-আরাফ ৭:১৭৯)।

অনেক মুসলিমকে সহীহ হাদিস পালন করার পরিবর্তে অমুকের মতবাদ ভাল; অমুকের মতে হাদিসটি না মানলেও চলে। ইত্যাদি বলে বিভ্রান্ত করা কি সঠিক কাজ?

শয়তানের আর একটি ফাঁদ হল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে জাল হাদিস রচনা ও প্রচার করা। সুতরাং, হাদিস পালনের ক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে। হাদিস শুধু শ্রবণ করাই যথেষ্ট নয়। বরং তা যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা করে আমল করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অনেক সময় মানুষ অসুস্থ হলে মূর্খ কবিরাজ, বৈদ্ধ ও ফকিরের নিকট ধর্না দিয়া থাকে। চিকিৎসার নামে শিরকী, ভ্রান্ত তাবিজ-কবজ, হাত-চালানী, বাটি-চালানী, মারধর ইত্যাদি প্রথা প্রচলিত আছে। অথচ হাদিসে আছে, প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা আছে, ঔষধ আছে। ধর্মীয় সঠিক শিক্ষার অভাব ঔপনিবেশীক শাসনের কুফলে নানা মানষিক অসুস্থতা, বর্তমানে ডিজিটাল প্রযুক্তির জটিলতায় সবাই এখন দিশেহারা। সত্যের সন্ধান না করে, হায় হোসেন! হায় হোসেন! করছে। লেবাছধারী কিছু লোক যাদের অনেকের নিকট কুরআনের তফসীর, সহীহ-হাদীস, ফিকাহ্ এবং ইসলামের ইতিহাসের পরিবর্তে শুধু সূফিদের লেখা মনগড়া কিস্সা-কাহিনীর কিতাব পাওয়া যায়। তাদের থেকে কীভাবে নির্ভূল ও সঠিক দ্বীন আশা করা যায়?

সাধারণ জ্ঞান ৫. সবার প্রশ্ন: আল্লাহ্ কোথায়?

মুসলিমদের আল্লাহ্ আরশের উপর সমাসীন: এ মর্মে কুরআনে ৭টি আয়াত আছে। আল্লাহর্ বানী (১): "নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্, যিনি আকাশ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হন। তিনি রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন দিবসকে, যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে তড়িৎ গতিতে। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সবাই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখো, সৃষ্টি করা আর হুকুমের মালিক, তিনিই, আল্লাহ হলেন বরকতময়, রব্বুল আলামিন।" (সূরা আ'রাফ ৭:৫৪)। আল্লাহ্র বানী (২): "নিশ্চয়.আল্লাহই হচ্ছেন তোমোদর রব, যিনি আকাশসমূহকে ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন, তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন; তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশকারী নেই। এমন আল্লাহ হচ্ছেন তোমাদের রব। অতএব, তোমরা তার ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহন করবে না।"(সূরা ইউনুস ১০:৩)। আল্লাহ্র বানী (৩): "আল্লাহ্ই উর্ধ্বদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছো। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মানুবর্তী করলেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শন সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা তোমাদের পালকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।" (সূরা রাদ ১৩:২)। আল্লাহ্র বানী (৪): "আর-রহমান আরশে সমাসীন।"(সূরা ত্ব-হা ২০: ৫)। আল্লাহ্র বানী (৫): "তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি আরশে

সমাসীন হন। তিনিই রহমান, তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।" (সূরা আল-ফুরক্বান ২৫:৫৯)। আল্লাহ্ বানী (৬): "আল্লাহর তিনি, যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যর্বতী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ওলী নেই এবং সাহায্যকারীও নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?" (সূরা সাজদাহ ৩২:৪)। আল্লাহ্র বানী (৭): "তিনিই ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু অবতীর্ণ হয় ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানে থাকো না কেন তিনি (জ্ঞানে) তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা দেখেন।"(সূরা আল-হাদিদ ৫৭:৪)।

(عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى অর্থ-আরশে সমাসীন, আরশে সমুন্নত, আরশে অধীষ্ঠিত ইত্যাদি বিভিন্ন বাংলা অনুবাদে উল্লেখ আছে।) আল্লাহ্র বানী (৮): "তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশের উপর রয়েছেন তিনি তোমাদেরসহ ভূমিকে ধসিয়ে দিবেন না? আর তখন ওটা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে। অথবা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, আকাশের উপর যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঝঞ্জাবায়ু প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী?" (সূরা আল-মূলক ৬৭:১৬-১৭)। ফেরাঊন নিজেকে 'বড় রব' দাবী করেছিল এবং কাফির হওয়া সত্ত্বেও তার বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ আকাশের উপর আছেন। আল্লাহ্র বানী (৯): "ফেরাঊন বলল, 'হে হামান! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মান কর, হয়ত আমি পেয়ে যাব অবলম্বন। আকাশে আরোহণের অবলম্বন, তারপর আমি সেখান থেকে মুসার 'রবকে' উকি মেরে দেখব। আর আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে তার অপকর্মগুলকে সুশোভন করা হয়েছিল এবং তাকে বিরত রাখা হয়েছিল সরল-সঠিক পথ থেকে। আর ফেরাউনের চক্রান্ত তো ব্যার্থ হওয়ারই ছিল।"(সূরা মু'মিন ৪০:৩৬-৩৭)|

হাদীস- আল্লাহ্ আকাশের উপর আছে। এ বিসয়ে অনেকগুলি হাদিস আছে। "আবু হুরায়রা (রাদি.) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ্ দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছ যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছ যে আমার কাছে কিছু চাইবে আর আমি তাকে তা দান করব। কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।" (সহীহ বুখারী-১১৪৫; সহীহ মুসলিম-৭৫৮; আবু দাউদ-১৩১৫; ইবনু মাজাহ-১৩৬৬; মিশকাত-১২২৩)।

ফিকাহ্-

আল্লাহ কোথায় ? এ বিষয়ে ৪ মাজহাবের ইমামগণ কি বলেছেন।

(১) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেছেন: "যে বলবে আল্লাহ্ আকাশে আছেন, না যমীনে আছেন তা আমি জানি না, সে কুফরী করল। কেননা আল্লাহ বলেন: রহমান আরশে সমাসীন। আর তার আরশ সপ্ত আকাশের উপর।"
(২) ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন: "আল্লাহ আকাশের উপর এবং তাঁর জ্ঞানের পরিধি সর্বব্যাপী বিস্তৃত। কোন স্থানই তাঁর জ্ঞানের আওতার বহির্ভূত নয়।"
(৩) ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেছেন: 'সুন্নাহ সম্পর্কে আমি যেসকল বিদ্বানকে দেখেছি এবং তাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি যেমন সূফিয়ান, মালেক ও অন্যান্যরা, তাদের মত হল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোন (হক্ব) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্র রাসূল। আর আল্লাহ আকাশের উপর তাঁর আরশে সমাসীন। তিনি যেমন ইচ্ছা তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী হন এবং যেমন ইচ্ছা তেমন নীচের আকাশে অবতরণ করেন'।
৪) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ বলেছেন: 'আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি থেকে দূরে সপ্তম আকাশের উপরে তাঁর আরশে সমাসীন। তাঁর ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিধি সর্বত্র বিস্তৃত। এর উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ! তিনি (আল্লাহ) আরশের উপর সমাসীন এবং তাঁর জ্ঞানের বহির্ভূত কিছুই নেই।

সাধারণ জ্ঞান ৬. ইসলামের ৩টি প্রধান মূলনীতি জানা জরুরি।

ইসলামের ৩টি প্রধান মূলনীতি কী ?
যে কোন বিষয়ের কিছু মূলনীতি থাকে। ইসলামেও তেমনি কিছু মুলনীতি আছে। যেনে, শুনে, বুঝে, স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে এবং দৃঢ়তার সাথে ইসলাম গ্রহন করলে তিনিই হবেন প্রকৃত মুসলিম। (Those who accept Islam by Choice, not by chance , emotion or inheritance is the real Muslim) একজন মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীর জন্য প্রথম কোন ইলেম বা জ্ঞান অর্জন করা ফরজ ? তা হচ্ছে প্রথম জ্ঞান- সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ্ যিনি রব, দ্বিতীয় জ্ঞান- দ্বীন ইসলাম এবং তৃতীয় জ্ঞান- রাসূলুল্লাহ্ মুহাম্মদ (ﷺ) সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। ইহাই ইসলামের ৩টি প্রধান মূলনীতি।

ইসলামের প্রথম মূলনীতি:
'রব' ও তার বান্দার মারিফাত বা পরিচয় সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের দলিল প্রমাণ অনুসারে জানা এবং মানা। আল্লাহ বান্দার একমাত্র 'রব'। বান্দা একমাত্র 'রবের'

ইবাদাত করবে। চাওয়া, পাওয়া, সুখ, দুখ, ভয় ও ভরসা রাব্বুল আলামীনের নিকটে।

ইসলামের দ্বিতীয় মূলনীতি:

'দ্বীন ইসলামের' মারিফাত বা পরিচয় কুরআন ও হাদীসের দলিল প্রমাণ অনুসারে জানা ও মানা। ইসলাম অর্থ একমাত্র আল্লাহর নিকট নিজেকে আত্মসমর্পণ করা। প্রথম স্তর ইসলাম, দ্বিতীয় স্তর ইমান ও তৃতীয় স্তর ইহসানের উপর ইমান রাখা।

ইসলামের তৃতীয় মূলনীতি:

মুহাম্মদ (ﷺ) আমাদের রাসূল। তার পরিচয় সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের দলিল প্রমাণ অনুসারে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। তার বংশ পরিচয় জীবনী জানা ও অধ্যায়ন করা। যেমন, মুহাম্মদ (ﷺ), তাঁর পিতা আবদুল্লাহ। তাঁর পিতা (পিতামহ) আব্দুল মুতালেব। তাঁর পিতা (প্রপিতামহ) হাশেম। হাশেম কুরাইশ বংশোদ্ভূত আরব জাতি। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) হতে শুরু। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মাতার নাম আমিনা বিনতে ওহাব মাদানী। কুরআন ও হাদীসের দলিল-প্রমাণ মোতাবেক তিনি স্বাভাবিক সৃষ্টিগতভাবে মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন। ৪০ বৎসর বয়সে নবুওয়্যাত পান। ১৩ বৎসর মক্কাতে এবং ১০ বৎসর মদীনাতে দ্বীন ইসলাম প্রচার করেন। ৬৩ বৎসর জীবিত থাকার পর ১০ হিজরি ১২ই রবিউল আউয়াল মদীনাতেই মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি কবরে আছেন। বিস্তারিত জানতে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর শ্রেষ্ঠ জীবনীর সেরা ইতিহাস 'আর-রাহীকুল মাখতুম' সউদি আরব থেকে প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ অনুশীলন করলে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে।

সাধারণ জ্ঞান ৭. ইসলামের ৫টি রুকন, জানা ও মানা ফরজ।

মুসলিম নর-নারীর ইসলাম শিক্ষার বিষয়ে আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করেন: "পাঠ করুন আপনার 'রবের' নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার 'রব' অতিশয় দয়ালু। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।" (সূরা আলাক: ৯৬: ১-৫)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর সর্ব প্রথম কুরআনের এই পাঁচটি আয়াত অবতীর্ন হয়েছিল। যা পড়া ও লেখার গুরুত্ব বহন করে। শুরুতেই পড়ার নির্দেশ 'রবের' নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড থেকে। এর অর্থ পুরুষের চেয়ে মহিলাগণই ভাল বোঝে। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। এর অর্থ শুরু থেকে শিশুকে মায়েরা মৌখিকভাবে ভাষাসহ আচার ব্যবহার সবকিছু শিক্ষা দিবে। ২য় ধাপে

ভাষার জন্য অক্ষর লেখা শিক্ষা দিবে খাতা-কলমের মাধ্যমে। যাতেকরে জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান সংরক্ষণ দু'টিই দীর্ঘ স্থায়ী হয়। শিশুর কথা বলা শেখার পর পরই ইসলাম, ইমান ইহ্সান বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষার শুরু করতে হয়। আল্লাহ্, দ্বীন ইসলাম ও মুলিম সম্পর্কে মৌলিক ও নির্ভূল শিক্ষা গ্রহণ করা সবার জন্য ফরজ। এর সাথে মাতৃভাষা, আরবি ভাষা কুরআন ও হাদিস শিক্ষা করা ফরজ। অতপর যত খুশি ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, টেকনোলজী, হালাল পেশাগত বিদ্যা এবং গৃহস্থলির বিভিন্ন কাজ শিক্ষায় মহিলাদের বাধা নেই।

একজন মুসলিম পুরুষ ও নারীর জন্য কোন ইলেম অর্জন করা ফরজ ? প্রথম: সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ, দ্বিতীয়: দ্বীন-ইসলাম এবং তৃতীয়: নবী মুহাম্মদ (ﷺ) সম্পর্কে কুরআন ও সহীহ্ হাদিস থেকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।

* আধুনিক অনেক দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায় নীতি, আদব কায়দা, ছোট বড়, বিভিন্ন পদমর্যাদার লোকের সাথে একে অপরের সাথে ব্যবহার ইত্যাদির উপর বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেয়া হয়।

ইসলামের ৫ টি রুকনের উপর হাদিস।

"ইবনে উমর (রাদি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: ইসলামের রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। (১) لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া। (২) সালাত কায়েম করা। (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) হজ্ব সম্পাদন করা এবং (৫) রমাজানের সিয়াম পালন করা।" (সহীহুল বুখারী তা.পা. ৮; ই.ফা. ৭; মুসলিম ১/৫/ হা. ১৬)।

যারা এই পাঁচটি বিষয় জানে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং কাজে পরিণত করে তাদেরকে মুসলিম বলা হয়।

সাধারণ জ্ঞান ৮. ইমানের ৬টি রুকন, জানা ও মানা ফরজ।

ইমানের ৬টি রুকনের উপর কুরআনুল কারিমে আল্লাহ্র বানী: "সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, **ইমান** আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিবসের ওপর, মালাইকাদের ওপর, কিতাবের উপর এবং নবী-রাসূলগণের ওপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তারই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং

অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী, তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেজগার।" (সূরা আল-বাকারা ২:১৭৭)।

ইমানের বিষয়ে কুরআনের অন্য আয়াত: "রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তার রবের পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনরাও বিশ্বাস রাখে। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তার মালাইকাদের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি এবং তার রাসূলগণের প্রতি। তাঁরা বলে, আমরা তার রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তাঁরা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই, হে আমাদের রব। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (সূরা বাকারা, ২:২৮৫)।

ইমানের ৬টি রুকনের উপর হাদিস।

"আবু হুরায়রা (রাদি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর। কিন্তু লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করতে সংকোচ বোধ করল। বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁর হাঁটুর কাছে বসে বললো: হে আল্লাহর রাসূল, 'ইসলাম' কী? উত্তরে তিনি বললেন: 'তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, এবং রমজান মাসে সিয়াম পালন করবে।' সে বললো আপনি সত্যই বলেছেন। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! **'ইমান' কী?** তিনি বললেন, 'তুমি আল্লাহ, তাঁর মালায়কা, তাঁর কিতাব, আখিরাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি **ইমান** রাখবে। মরনের পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি **ইমান** রাখবে এবং তাকদীরের উপরও পূর্ণ **ইমান** রাখবে।' সে বললো আপনি সত্যই বলেছেন। এবার সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! **'ইহসান' কী ?** তিনি বললেন, 'তুমি এমনভাবে আল্লাহকে ভয় করো যেন তুমি তাঁকে দেখছ, আর যদি তুমি তাঁকে না দেখ, তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করো।' সে বললো আপনি সত্যই বলেছেন। এবার সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন হবে ? তিনি বললেন, এ ব্যপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক কিছু জ্ঞাত নয়। তবে আমি তার নিদর্শন ও লক্ষণ সমূহ তোমাকে বলে দিচ্ছি, যখন দেখবে কোন নারী তার মুনিবকে প্রসব করবে এটা কিয়ামতের একটি নিদর্শন। যখন তুমি দেখবে, জুতা বিহীন, বস্ত্রহীন, বধির ও বোবা পৃথিবীতে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, এটা তাঁর একটি নিদর্শন। আর যখন তুমি দেখবে মেষ চালকরা সুউচ্চ দালান-কোঠা নিয়ে গর্ব করছে, এটা তার (কিয়ামতের) একটি নিদর্শন। যে পাঁচটি অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না, কিয়ামতের জ্ঞান তারই অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ আয়াতটি পাঠ করলেন "অবশ্যই আল্লাহর নিকটই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন। কোন জীবই আগামী কাল কী উপার্জন করবে তা জানে না এবং কোন এলাকায় সে মরবে তাও জানেনা।" তিনি সূরা লুকমানের শেষ পর্যন্তই পাঠ করলেন। এরপর লোকটি চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবাদের বললেন, তোমরা লোকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অথচ অনেক খোজা-খুজি করা হলো কিন্তু তারা তাঁকে আর পেলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তিনি হলেন জিবরাঈল (আ:)। যখন তোমরা আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করছিলেনা তখন তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।" (সহীহুল বুখারী তা.পা হাদিস নং ৭)।

(ক) ইমান মুফাস্সাল (বিস্তারিত ইমান):

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْقَدْرِ خَيْرِه وَشَرِّه مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

আরবি উচ্চারণ- "১. আমানতু বিল্লাহে, ২. ওয়া মালাইকাতিহি, ৩. ওয়া কুতুবিহী, ৪. ওয়া রুসুলিহী, ৫. ওয়া ইয়াওমিল আখিরি, ৬. ওয়াল কাদরি। ৭. খাইরিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লাহি তাআলা, ওয়াল বা'সি বাদ'আল মাউত।"

বাংলা অর্থ- "১. আমি আল্লহ্‌র উপর ইমান আনলাম, ২. এবং তাঁর মালাইকার উপর ইমান আনলাম। ৩. এবং তাঁর কিতাবের উপর ইমান আনলাম, ৪. এবং তাঁর রাসূলের উপর ইমান আনলাম, ৫. এবং আখিরাতের উপর ইমান আনলাম, ৬. এবং তাকদিরের উপর ইমান আনলাম। ৭. ভাল মন্দ আল্লাহ্‌ থেকে হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ইমান আনলাম।"

এর সাথে কুরআন ও সহীহ-হাদীসে প্রমাণিত সকল আদেশ, নিষেধ, ইবাদত ও আমলের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। ইমান ও আকিদা এমন দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যাতে কোন সন্দেহ, সংশয় ও দোদুল্যমনতার সংমিশ্রণ থাকবে না। বিশ্বাস স্থাপন করার সাথে কুফর ও তাগুতকে অবিশ্বাস, শিরক বর্জন ও অস্বীকার করতে হবে।

(খ) ইমান মুজমাল (সংখিপ্ত ইমান):

আমাদের দেশে কালিমা শাহাদতের পরেই শিখান হয় ইমান মুজাম্মাল অর্থ সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস যা নিম্নরূপ:

اٰمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَ صِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِهِ وَأَرْكَانِهِ

উচ্চারণ: "আমান্তু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআসমাইহি ওয়া সিফাতিহী ওয়া কাবিলতু জামী'আ আহ্কামিহী ওয়া আরকানিহী।"

অর্থ: আমি ইমান আনলাম আল্লাহ্র উপর ঠিক তেমনি, যেমন তিনি আছেন তাঁর সব নাম ও গুনাবলিসহ। আর গ্রহন করলাম সকল আহ্কাম ও আরকান।

ইমান মুজমালে চারটি বিষয়ের উপর ইমান আনার বিষয় উল্লেখ আছে- (১) আল্লাহ্র ৯৯টি গুনবাচক নাম আমরা জানি। (৮২টি কুরআন থেকে এবং ১৭ টি হাদিস থেকে), (২) আল্লাহ্র গুনাবলির যদিও শেষ নেই, তবে তা থেকে কিছু জানা যায়, (৩) আহ্কাম নিচে (সাধারণ জ্ঞান ৯) দেয়া হলো, (৪) আরকান যা ইমান মুফাস্সাল ৬টি আরকান উপরে দেয় হয়েছে।

সাধারণ জ্ঞান ৯. ইমানের ৯ টি আহ্কাম। (হুকুমের বহু বচন আহকাম)।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইমানের ৬টি আরকান পূর্বে উল্লেখ করেছি। কুরআন আল মজিদে ইমানের ৯ টি আহ্কাম পাওয়া যায়।

ইমানের প্রথম হুকুম: ইলেমের সাথে অর্থাৎ জেনে শুনে ইমান আনা। যে বিষয় সম্পর্কে জেনে শুনে বিশ্বাস করতে হবে। অর্থাৎ অনুশীলন ও দলিল ভিত্তিক বিশ্বাস করার জন্য আল্লাহ আদেশ করছেন। জেনে শুনে ইমান আনার জন্য আল্লাহ বলেন:"অতএব জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও তোমাদের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন।" (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:১৯)। আল্লাহর নাযিলকৃত কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ইমান আনার নির্দেশে আল্লাহর বাণী: "আর আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করুন আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুস্মরণ করবেন না, আর তাদের সন্মন্ধে সতর্ক থাকবেন যেন তারা আপনাকে বিচ্যুত না করতে পারে আপনার যা নাযিল করা হয়েছে তাঁর কোন কিছু থেকে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ চান তাদের কোন কোন পাপের জন্য তাদের শাস্তি প্রদান করতে। আর মানুষের মধ্যে তো অনেকেই ফাছেক।" (সূরা মায়িদাহ ৫:৪৯)। স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণকারী পথভ্রষ্ট; এ বিষয়ে আল্লাহর বাণী: "তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে আপনি জানবেন যে, তারা শুধু স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। আল্লাহর হেদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? আল্লাহ তো জালেম লোকদের পথ দেখান না।" (সূরা কাসাস ২৮:৫০)।

ইমানের দ্বিতীয় হুকুম: ইয়াকিনের অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ইমান আনা। ইয়াকিনের ৩টি পর্যায়: প্রথম পর্যায়: 'ইলমুল-ইয়াকিন'। কোন কিছু যেনে শুনে অথবা ঐ বিষয়ে লেখা পড়া করে যে জ্ঞান ও বিশ্বাস হয় তাকে বলে 'ইল্‌মুল-ইয়াকিন'। যেমন আল্লাহ বলেন: "কখনই নয়, যদি তোমরা নিশ্চিতরূপে জানতে (ইলমুল-ইয়াকিন)।" (সূরা তাকাসূরা ১০২:৫)। দ্বিতীয় পর্যায়: 'আইনুল-ইয়াকিন। কোন কিছু জেনে, শুনে, বুঝে এবং নিজে দেখার পর যে জ্ঞান ও বিশ্বাস হয় তাকে বলে 'আইনুল-ইয়াকিন'। যেমন আল্লাহ বলেন: "আবার বলছি: অবশ্যই তোমরা তা দেখবেই প্রত্যক্ষ বিশ্বাসে (আইনুল-ইয়াকিন)।" (সূরা তাকাকাসূরা ১০২:৭)। তৃতীয় পর্যায়: 'হাককুল-ইয়াকিন' কোন কিছু জেনে, শুনে, বুঝে এবং নিজে দেখার পর যে অনুভূতি অনুভব করে এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাস অর্জিত হয় তাকে বলে 'হাককুল-ইয়াকিন'। যেমন আল্লাহ বলেন:

"এটি তো নিঃসন্দেহে ধ্রুবসত্য ('হাক্‌কুল-ইয়াকিন')" (সূরা ওয়াকিয়া ৫৬:৯৫)। প্রকৃত মু'মিন ও দৃঢ় বিশ্বাসী কারা ? এ বিষয়ে আল্লাহর বাণী:

"প্রকৃত মু'মিন তো তারাই, যারা ইমান এনেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, পরে কখনও সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করেছে; তারাই সত্যবাদী ('সাদেকুন') লোক।" (সূরা হুযরাত ৪৯:১৫)

ইমানের তৃতীয় হুকুম: আল-কবুল। পরিপূর্ণ রুপে অন্তর থেকে মেনে নেওয়া। আমরা ঈমানে মোজাম্মিলে মুখস্ত করি 'কাবিলতু জামিয়া' (মেনে নিলাম সামগ্রীকভাবে) 'আহকামিহী ওয়া আরকানিহী'। তার যাবতীয় আহকাম এবং আরকানসহ। কিন্তু এই আহকাম এবং আরকানগুলো কী তা বিস্তারিত জানা হয় না। কীভাবে ইমান আনতে হবে সে বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে বিস্তারিত বলেন:

"তোমরা বল: আমরা ইমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্‌রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তার বংশধরদের প্রতি এবং যা দেয়া হয়েছে মুসা ও ঈসাকে এবং যা দেয়া হয়েছে অন্যান্য নবীদের তাদের 'রবের' নিকপ থেকে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।" (সূরা বাকারা ২:১৩৬)। পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করার জন আল্লাহর স্পষ্ট বাণী: "ওহে যারা ইমান এনেছ! তোমরা পরিপূর্ণরুপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারা ২:২০৮)।

ইমানের চতুর্থ হুকুম: আল-ইনকিইয়াদ (الإنقياد) অর্থাৎ পরিপূর্ণ সংরক্ষণ এর সাথে ইমান আনা। এ বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে বলেন: "ওহে যারা ইমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও।" (সূরা তওবা ৯:১১৯)। এই

আয়াত যখন নাযিল হয় তখন 'সাদেকিন' সত্যবাদী কারা ছিল? নিশ্চয় সন্মানিত সাহাবাগণ; তাদের অনুসরণ করতে পারলেই 'সাদেকিন' হওয়া সম্ভব। অন্যথায় শুধু দাবী করলেই 'সাদেকিন' হওয়া যাবে না। 'রবের' আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া অপরাধ। এ বিষয়ে আল্লাহর বাণী:

"ঐ ব্যাক্তির চাইতে অধিক জালিম কে, যাকে তার 'রবের' আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু সে তা থেকে মুখ ফিরায়। আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব।" (সূরা সাজদা ৩২:২২)। 'রবের' কাছে আত্মসমর্পণ না করলে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না; আল্লাহর বাণী: "তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর। তোমাদের উপর আযাব আসার পূর্বে। অতঃপর তোমরা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।" (সূরা যুমার ৩৯:৫৪)। রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচার মেনে না নিলে মু'মিন হবে না; আল্লাহর বাণী: "তবে না; আপনার রবের কসম! তারা মু'মিন হবে না যে পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে সেসব বিবাদে যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়, তারপর তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বোধ না করে আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।" (সূরা নিসা ৪:৬৫)।

ইমানের পঞ্চম হুকুম: আল-সিদ্ক। অর্থাৎ সত্যবাদিতার সাথে ইমান আনা। আল্লাহ কুরআনে বলেন: "লোকেরা কি মনে করে যে, 'আমরা ইমান এনেছি' একথা বলেই তারা অব্যাহতি পেয়ে যাবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; অতএব আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন তাদেরকে যারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন মিথ্যাবাদীকেও।" (সূরা আংকাবুত ২৯:২-৩)। মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী সে বিষয়ে আল্লাহর বাণী: "মুনাফিকরা যখন আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আরা আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয় আপনি তো তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" (সূরা মুনাফিকুন ৬৩:১)।

ইমানের ষষ্ঠ হুকুম: ইখলাস বা একনিষ্ঠার সাথে ইমান আনা। মানুষের মধ্যে বহুলোক ইমান আনে বটে তবে একমাত্র আল্লাহর উপর নয়। কিছু আল্লাহর উপর কিছু, গায়রুল্লাহর উপর কিছু । ফলে তারা আল্লাহর ইবাদতের সাথে গায়রুল্লাহর ইবাদতও করে থাকে। বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। আল্লাহ বলেন: "অথচ তাদেরকে তো এই আদেশ প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে। আর সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে এটাই সঠিক দ্বীন।" (সূরা বায়্যিনা ৯৮:৫)। রবের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করার জন্য আল্লাহর বাণী:

"বলুন: আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার উপর ওহী প্রেরিত হয় যে, তোমাদের মা'বুদ তো একই মা'বুদ। সুতরাং যে ব্যাক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভের আশা রাখে সে যেন নেক কাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে।" (সূরা কাহাফ ১৮:১১০)। আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করা মহাপাপ; আল্লাহর বাণী: "নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ। তবে তিনি ক্ষমা করেন এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে সে তো এক মহাপাপে লিপ্ত হয়।" (সূরা আন-নিসা ৪:৪৮)। এতো প্রমানের পরও মানুষ আল্লাহর পরিচয় নিয়ে প্রশ্নের জওয়াবে আল্লাহ একটি পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ করেন যার নাম 'সূরা ইখলাস'। আল্লাহ বলেন: "আপনি বলুন: আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ অভাবশূন্য; অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয় নি। আর কেউ তাঁর সমতুল্য নেই।" (সূরা ইখলাস ১১২:১-৪)।

ইমানের সপ্তম হুকুম: এস্তেকামাতের সাথে ইমান আনা। স্থিরভাবে একমাত্র আল্লাহর উপরই ইমান আনতে হবে এ বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে বলেন: "আপনি বলে দিন: যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহকে ভালবাসার দাবী কর তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-ইমরান ৩:৩১)। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে তাঁর সমকক্ষরূপে গ্রহণ না করার জন্য আল্লাহর বাণী: "মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে তাঁর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে যেরুপ ভালবাসতে হয় সেরুপ তাদের ভালবাসে। কিন্তু যারা প্রকৃত ইমান এনেছে আল্লাহর তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম। শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর জালিমরা যেমন বুঝবে এখন যদি তারা তেমন বুঝতো! নিশ্চয় সবশক্তি শুধু আল্লাহরই এবং আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।" (সূরা বাকারা ২:১৬৫)। কুফরী করলে দুর্গতি আসবে। আল্লাহর বাণী: 'আর যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। তা এই কারনে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা অপছন্দ করেছে, কাজেই তিনি তাদের কর্ম বিফল করে দিয়েছেন।" (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:৮-৯)।

ইমানের অষ্টম হুকুম: তাগুতকে অস্বীকার এবং তার পূজা থেকে বিরত করার জন্য আল্লাহর বাণী: "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই কোন না কোন রাসূল প্রেরণ করেছি এ নির্দেশ প্রচারের জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে কতককে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন এবং কতকের উপর গোমরাহী অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, মিথ্যারোপকারীদেও পরিণাম কেমন হয়েছে ?" (সূরা নাহাল ১৬:৩৬)।

তাগুতের পূজা থেকে বিরত থাকতে আল্লাহর বাণী: "আর যারা তাগুতের পূজা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে।" (সূরা যুমার ৩৯:১৭)।

ইমানের নবম হুকুম: কলবের রোগ মুক্তির সাথে ইমান আনা। মানুষের শরীরের রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য ডাক্তার আছে। মানুষের অন্তরের রোগ নির্ণয়ের জন্য এবং রোগ নিরাময়ের জন্য তেমনি আল্লাহ কুরআনে নানা উদাহরণসহ আয়াত এবং হাদীসে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। হিংসা, হাছাদ, সন্দেহ, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, মিথ্যা বলা, ইবাদতে শির্ক করা ইত্যাদি সবই অন্তরের রোগ। কলবের রোগের বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "তাদের কলবে রয়েছে রোগ। তারপর আল্লাহ তাদের রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কেননা তারা মিথ্যা বলত।" (সূরা বাকারা ২:১০)। কলবের রোগের বিষয়ে আল্লাহর বাণী: "যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা কি ধারণা করে যে, আল্লাহ তাদের শত্রুতাকে কখনও প্রকাশ করবেন না ?" (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:২৯)। কলবের রোগের বিষয়ে আল্লাহর বাণী: "আর যখনই কোন সূরা নাযিল করা হয় তখন তাদের মধ্যকার কেউ কেউ বলে: এ সূরাটি তোমাদের কার ইমান বৃদ্ধি করল? তবে শোন, যারা ইমান এনেছে, এ সূরা তাদেরই ইমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা এতে আনন্দিত হয়। তবে যাদের অন্তরে রোগ ব্যাধি আছে, এ সূরা তাদের মলিনতার সাথে আরও মলিনতা বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায় মারা গেছে।" (সূরা তওবা ৯: ১২৪-১২৫)। কলবের রোগের বিষয়ে আল্লাহর বাণী: "এটা এজন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি (আল্লাহ) তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং পাষাণ হৃদয়। নিশ্চয় জালিমরা রয়েছে চরম-মতবিরোধিতায় লিপ্ত।" (সূরা আল-হজ্ব ২২:৫৩)। মোনাফিকের চরিত্র ও কলবের রোগের বিষয়ে আল্লাহর বাণী: "স্মরণ কর, মোনাফিকরা এবং যাদের কলবে রোগ ছিল তারা বলেছিল: এদের বিভ্রান্ত করেছে এদের ধর্ম। বস্তুত যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী, হেকমতওয়ালা।" (সূরা আনফাল ৮:৪৯)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: "আর মোনাফিকরা এবং যাদের কলবে রোগ ছিল, তারা বলেছিল: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যা দিয়েছিল তা প্রতারনা ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সূরা আহ্যাব ৩৩:১২)। পরপুরুষের সাথে পত্নীগণ কিভাবে বাক্যালাপ ও কথা বলবে এ বিষয়ে আল্লাহর আদেশ: "হে নবী পত্নীগণ! তোমরা কোন সাধারণ নারীর মত না; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপে এমনভাবে কোমল কণ্ঠে কথা বল না যাতে কলবে যার কুপ্রবত্তির রোগ রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা রীতি অনুসারে কথা বলবে।" (সূরা আহ্যাব ৩৩:৩২)।

উপরের আয়াতগুলিতে মুনাফিক সহ সত্যা প্রত্যাখানকারী এবং মিথ্যাবাদীদের কলবের রোগের প্রতিকারের বিষয়ে কুরআনেই সমাধান আছে।
"বলুন এ কুরআন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তার রহমত। তারা সবাই এতে আনন্দিত হোক। তারা যা কিছু জমা করে তার চেয়ে এ কুরআন অনেক উত্তম।" (সূরা ইউনুস ১০:৫৮)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: "আর আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত। কিন্তু তা জালিমদের কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" (সূরা বনি-ইসরাইল ১৭:৮২)। এরপর আল্লাহ বলেন: ". . . . আপনি বলুন: এটি মু'মিনদের জন্য হেদায়াত ও রোগের প্রতিকার। কিন্তু যারা ইমান আনে না তাদের জন্য রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্বস্বরুপ। তারা এমন য়ে, তাদেরকে যেন বহুদুর থেকে আহবান করা হয়।" (সূরা হা-মীম সজদা ৪১:৪৪)। এভাবে আরও কিছু আয়াত এবং হাদিসে উল্লেখ আছে, যা জানলে, বিশ্বাস করলে এবং সেই অনুয়ায় আমল করলে কলবের রোগ নিরাময় হবে এবং আখিরাতে জান্নাত পাওয়ার আশা করা যায়।

সাধারণ জ্ঞান ১০. ইহ্‌সানের উপর ইমান রাখা ফরজ।

ইহ্‌সান কী ? ইহ্‌সান হল এমন একটি গায়েবী ইমান (বিশ্বাস), যা না দেখে দূরভাবে মানতে হবে। "তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদৎ করো যেন তুমি তাঁকে দেখছ, আর যদি তুমি তাঁকে না দেখ, তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করো।" আল্লাহ্‌র ইবাদত এমনভাবে করা, যেন ইবাদতকারী আল্লাহকে দেখতে পায়। অথচ তা সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে দেখছেন বলে বিশ্বাস অটল রাখা, ভয় করা এবং অনুভব করার নামই ইহ্‌সান। ইহসানের মাত্র এই একটি রুকন।

ইহ্‌সানের বিষয়ে কুরআনে আল্লাহর বাণী: (১)
"যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি সালাতে দাড়াও এবং সিজদাকারীদের সাথে তোমার উঠা-বসাও দেখেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা শুআরা ২৬: ২১৮-২২০)।
ইহ্‌সানের বিষয়ে কুরআনে আল্লাহর বানী: (২)
"আর তুমি যে অবস্তায়ই থাক এবং সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা কিছু তিলাওয়াত কর, আর তোমরা যে কাজই কর, আমি তোমাদের কাছে উপস্তিত থাকি, যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আসমান ও জমিনের অনুপরিমানও তোমার রবের থেকে গোপন থাকে না এবং এর চেয়ে কোন কিছু ক্ষুদ্রতর কিংবা বৃহত্তর নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।" (সূরা ইউনুস ১০: ৬১)
ইহ্‌সানের বিষয়ে কুরআনে আল্লাহর বানী: (৩)

"তিনিই আল্লাহ নভোমন্ডলে এবং ভূমন্ডলে। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে জানেন এবং তোমরা যা কর তাও অবগত।" (সুরা আন'আম ৬:৩)।

ইহ্সানের বিষয়ে কুরআনে আল্লাহর বানী: (৪)

"..... কোন কিছুই তাঁর সাদৃশ নয়। তিনি সব শুনেন সব দেখেন।" (সূরা আশ-শুরার অংশ ৪২:১১)।

ইহ্সানের বিষয়ে কুরআনে আল্লাহর বানী: (৫)

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা নেককার।" (সূরা নাহল ১৬: ১২৮)।

ইহ্সানের বিষয়ে ইমান রাখার হাদিস:

"আবু হুরায়রা (রাদি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) সাহাবাদেরকে বলেন, তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর। কিন্তু লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করতে সংকোচ বোধ করল। বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁর হাঁটুর কাছে বসে বললো: ..... হে আল্লাহ্র রাসূল ! 'ইহ্সান' কি ? তিনি বললেন, "তুমি এমনভাবে আল্লাহ্কে ভয় করো যেন তুমি তাঁকে দেখছ, আর যদি তুমি তাঁকে না দেখ, তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করো। সে বললো আপনি সত্যই বলেছেন। .... এরপর লোকটি চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) সাহাবাদের বললেন, তোমর লোকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অথচ অনেক খোজা-খুজি করা হলো কিন্তু তারা তাঁকে আর পেলোনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, ইনি ছিলেন জিব্রীল (আ:)। যখন তোমরা (আমাকে) কিছুই জিজ্ঞেস করছিলেনা তখন তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।" (সহীহুল বুখারী তা.পা হাদিস নং ৭ এর অংশ)।

সাধারণ জ্ঞান ১১. ইমান ভঙ্গের ১০ টি কারন।

পবিত্রতা, ওযু, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি ভঙ্গের কারণ অনেকেই জানে। তবে ইমান ভঙ্গের কারণ অনেকেই জানে না। ওযু করার পর কিছু কাজ করলে যেমন ওযু নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ইমান আনার পর কিছু বিশ্বাস, কাজ ও উক্তি আছে, যা সম্পাদন করলে ইমান কমে ও নষ্ট হয়ে যায়। ইমান ভঙ্গের প্রধান কারণগুলো মূলত তিন ধাপে হতে পারে (ক) বিশ্বাসগত ইমান ভঙ্গ, (খ) কর্মগত ইমান ভঙ্গ (গ) উক্তিগত ইমান ভঙ্গ। ইমান ভঙ্গের প্রধান ১০ টি কারণ উল্লেখ করা হলো।

ইমান ভঙ্গের প্রথম কারণ:

আল্লাহর ইবাদতে শির্ক করলে ইমান ভেঙ্গে যায়। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন: "আর তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর এবং শরীক সাব্যস্ত করো না তাঁর সাথে কোন কিছুকে। আর সদ্বব্যবহার কর পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে, এতিমদের সাথে, মিসকিনদের সাথে, নিকট-প্রতিবেশী ও দূর-প্রতিবেশীর সাথে, সঙ্গী-সাথী ও পথচারীর সাথে এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক আর গর্বিত ব্যক্তিকে।" (সূরা আন-নিসা ৪:৩৬)। শির্ক বড় অপরাধ ও মহাপাপের বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ। তবে তিনি ক্ষমা করেন এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে সে তো এক মহাপাপে লিপ্ত হয়।" (সূরা আন-নিসা ৪:৪৮)। শির্ক করলে জান্নাত হারাম বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "নিঃসন্দেহে তারা কাফের যারা বলে মরিয়ামের পুত্র মাসীহ আল্লাহ; অথচ মাসীহ বললেন, হে বনী ঈসরাইল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব। নিশ্চয় যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নামে। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা আল-মায়েদা ৫:৭২)। শির্ক করলে আমল নিস্ফল হয়। এবিষয়ে আল্লাহ বলেন: "আর হে রাসূল, আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তীদের ওহী হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহর শরীক করেন তবে আপনার আমল সমূহ অবশ্যই নিস্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।" (সূরা আল-যুমার ৩৯:৬৫)। কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ চিন্তা করাও ছোট ও গোপন শির্ক হয়। এবিষয়ে আল্লাহ বলেন: "তিনি সেই রব যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ করেছেন এবং আকাশ থেক পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেন। অতএব, তোমরা জেনে-বুঝে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় কর না।" (সূরা বাকারা ২:২২)।

ইমান ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ:

আল্লাহ ও মানুষের মাঝে মধ্যস্থতা স্থির করলে, সুপারিশ কামনা ও তাওয়াক্কুল করার মতো কোনো মাধ্যম স্থির করলে ইমান ভেঙ্গে যায়। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন: "জেনে রেখ, নিষ্ঠাপূর্ণ বিশুদ্ধ ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য। আর যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে আওলিয়া হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং বলে যে, আমরা তো এদের পূজা এজন্য করি, যেন 'তারা' আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌছিয়ে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন সে বিষয়ে যে বিষয়ে তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে। আল্লাহ তো তাকে সত্যপথে পরিচালিত করেন না, যে মিথ্যাবাদী, কাফের।" (সূরা যুমযার ৩৯:৩)। এ বিষয়ে আল্লাহর বাণী: "আর তারা উপাসনা করে

আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর যা তাদের কোন ক্ষতিও করতে পারে না এবং কোন উপকারও করতে পারে না। তারা বলে: এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে আসমান ও জমিনে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি জানেন না ? তিনি পবিত্র এবং বহুউর্ধে তা থেকে যা তারা শরীক করে।" (সূরা ইউনুস ১০:১৮)। আল্লাহর উপর তাওয়াককুল করার বিষয়ে আল্লাহর বাণী: "আপনি আল্লাহর উপর তাওয়াককুল (ভরসা) করুন। বস্তুত আল্লাহই যথেষ্ট কার্য্যনির্বাহকরুপে।" (সূরা আহ্যাব ৩৩:৩)।

ইমান ভঙ্গের তৃতীয় কারণ:

মুশরিক-কাফিরদের কাফির মনে না করলে ইমান ভেঙ্গে যায়। যেমন ইহুদি, খৃস্টান, হিন্দু সম্প্রদায়, কবর পূজারী, খাম খেয়ালী ইবাদতকারী, আল্লাহকে একমাত্র রব হিসাবে অমান্যকারী, ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসাবে অমান্যকারী মুরতাদ, প্রকাশ্যে আল্লাহ, রাসুল বা দীনের কোনো অকাট্য ব্যাপার নিয়ে কটূক্তিকারী; যাদের কুফরির ব্যাপারে হকপন্থি আহলুস সুন্নাহ্র আলিমগণ একমত। তদেরকে কাফের ও মুশরিক হিসাবেই বিশ্বাস করতে হবে। কাফিরদের উদ্দেশ্যে সূরা কাফিরুন নাযিল করে তাদেরকে সম্ভোধন করে আল্লাহ বলেন: "আপনি বলে দিন: হে কাফিরবৃন্দ।" (সূরা কাফিরুন ১০৯:১)। তেমনি মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে সূরা মুনাফিকূন নাযিল করেছেন। এভাবে যারা শির্ক করে তাদেরকে মুশরিক উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন: "তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সংঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা যখন তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন- তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের 'ইবাদাত কর, তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমরা এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকবে।" (সূরা আল মুমতাহিনাহ ৬০:৪)।

ইমান ভঙ্গের চতুর্থ কারণ:

মুহাম্মদ (ﷺ)-এর দ্বীনের চাইতে অন্য দ্বীনের প্রাধান্য দিলে ইমান ভেঙ্গে যায়।

আল্লাহ বলেন: "যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আ-লে 'ইমরান ৩:৮৫)। আল্লাহ আরও বলেন: "এবং তিনি (মুহাম্মাদ) প্রবৃত্তির তাড়নায় (মনগড়া) কথা বলেন না। ক্বোরআন অহী ছাড়া কিছু না, যা প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা আন্ নাজম ৫৩:৩-৪)। আল্লাহ বিষেশভাবে বলেন: "তুমি কি তাদের দেখনি যাদের দেওয়া হয়েছিল কিতাবের এক অংশ তারা ইমান রাখে জিবত

ও তাগুতে এবং তারা কাফেরদের সম্বন্ধে বলে: এরাই মুমিনদের থেকে অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে।" (সূরা নিসা ৪:৫১)।

ইমান ভঙ্গের পঞ্চম কারণ:

মুহাম্মদ (ﷺ)-এর দ্বীনের বিধান সুন্নতকে অপছন্দ বা ঘৃণা করলে ইমান ভেঙ্গে যায়। আল্লাহর বাণী: "এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা পছন্দ করে না, সুতরাং আল্লাহ্ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৯)। আল্লাহ কুরআনে বলেন: "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিল আমি তো আপনাকে তাদের উপর সংরক্ষক হিসাবে পাঠাই নি।" (সূরা নিসা ৪:৮০)। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ অমান্য করে নিজস্ব সিদ্ধান্তের অধিকার নেই; আল্লাহর বাণী: "কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তার রাসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন সে কাজে তাদের কোন নিজস্ব সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।" (সূরা আহযাব ৩৩:৩৬)। আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার বিষয়ে আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, আর নিজেদের কাছে সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহও তাদের যাবতীয় কর্ম বিফল করে দেবেন।" (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:৩২)।

ইমান ভঙ্গের ষষ্ঠ কারণ:

মুহাম্মদ (ﷺ)-এর দ্বীনের বিরোধিতা ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করলে ইমান ভেঙ্গে যায়। কোরআনুল কারিম থেকে আল্লাহর বাণী:

(১) "আর যে ব্যাক্তি রাসূলের বিরোধিতা করবে তার কাছে সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুমিনের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করবে আমি তাকে সেদিকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে যায়। আর তাকে জাহান্নামে জ্বালাব। তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।" (সূরা নিসা ৪:১১৫)।

আল্লাহর বাণী: (২) "মুনাফিকরা ভয় করে, পাছে না এমন কোন সূরা তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যা তাদের অন্তরের (কলবের) কথা মু'মিনদের জানিয়ে দেয়। আপনি বলে দিন: তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রকাশ করবেন যা তোমরা ভয় কর।" (সূরা তওবা ৯:৬৪)।

আল্লাহর বাণী: (৩) "আর আপনি যদি তাদের প্রশ্ন করেন তবে তারা অবশ্যই বলবে: আমরা তো কেবল গল্পগুজব ও হাসি-তামাশা করেছিলাম। (হে রাসূল) বলুন তবে কি

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে।" (সূরা তওবা ৯:৬৫)।

আল্লাহর বাণী: (৪) "আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে এবং যারা কুফরী করছে আমি তাদের কিছু অবকাশ দিয়েছি, তারপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি। সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি ?" (সূরা রা'দ ১৩:৩২)।

আল্লাহর বাণী: (৫) "নিঃসন্দেহ আপনার পূর্বেও রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। অবশেষে যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা বিদ্রূপকারীদেরকেই পরিবেষ্টন করেছে।" (সূরা আম্বিয়া ২১:৪১)।

আল্লাহর বাণী: (৬) "নিশ্চয় যারা বিরোধিতা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তারাই হবে নিতান্ত হীন লোকদের দলভুক্ত।" (সূরা মুজাদালা ৫৮:২০)।

আল্লাহর বাণী: (৭) "এ শাস্তি এ কারনে যে তারা বিরুদ্ধাচারন করেছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের; আর যে কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে সে জেনে রাখুক যে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" (সূরা হাশর ৫৯:৪)।

আল্লাহর বাণী: (৮) "যখন সে আমার কোন আয়াত অবগত হয়, তখন সেটাকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করে। এদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সূরা আল জাছিয়াহ ৪৫:৯)।

ঠাট্টা-বিদ্রূপ দু'ভাবে হতে পারে-

প্রথমত স্পষ্ট বিদ্রূপাত্মক, তামাশামূলক, অশ্লীল-অশালীন কিংবা তাচ্ছিল্যপূর্ণ কথা দ্বারা। যেমন- খৃষ্টানগণ বলে, ইসা (আ:) আল্লাহ্‌র পুত্র'। ইয়াহুদীগণ বলে, ওযায়ের (আ:) আল্লাহ্‌র পুত্র,আল্লাহ্‌র হাত বন্ধ, আল্লাহ অভাবগ্রস্ত ও আমরা ধনী' ইত্যাদি। তথাকথিত কিছু পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবী বলে থাকে, ইসলাম ধর্ম বর্তমান কালে অচল-অনুপযোগী। যদি কোন মুসলিম জেনে শুনে এ ধরনের কোন কথা বলে, তাহলে তার ইমান ও ইসলাম বিনষ্ট হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত কাজ-কর্ম বা ইশারা-ইঙ্গিতে ব্যঙ্গ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, তামাশা করা । যেমন- দ্বীনে ইছলামের কোন বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন বা ছবি আঁকা, ক্বোরআনে কারীমের তিলাওয়াত শুনে কিংবা রাছূলের কোন হাদীছ শুনে বা আল্লাহর 'আযাব-গযব, পুরস্কার, জান্নাত, জাহান্নাম, ক্ব্‌বরের 'আযাব ইত্যদির আলোচনা না শুনার জন্য কানে আঙ্‌গুল ঢুকানো, উচ্চস্বরে কথা বলা বা রেডিও-টিভির ভলিয়ম বাড়িয়ে দেয়া। আল্লাহ্‌র কোন আয়াত বা নিদর্শনের কথা শুনে সেটাকে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ কোনরূপ অঙ্গভঙ্গি করা। যেমন- হাত টিপা, চোঁখ টিপা, জিহ্‌বা বের করা, মুখ বাঁকানো ইত্যাদি। যদি কোন মুছলমান জেনে-শুনে, বুঝে ইচ্ছাপূর্বক এ ধরনের কোন কাজ-কর্ম করে, তাহলে তার ইমান ও ইসলাম বিনষ্ট হয়ে যাবে। মোটকথা, দ্বীনে ইসলামের কোন বিষয়কে গালি-গালাজ বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, বা দ্বীন ইসলামের

কোন বিষয়কে নিয়ে ঢং-তামাশা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হলো কুফ্র ও শির্ক পর্যায়ের; যা ইসলামকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করে ইমানহীন করে।

ইমান ভঙ্গের সপ্তম কারণ:

যাদু হলো ইমান ও ইসলাম বিনষ্টকারী কাজ। আভিধানিক অর্থে যাদু বলা হয়- এমন প্রতিটি ক্রিয়াকলাপকে যার কারণ গোপন ও অস্পষ্ট থাকে, তবে এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখা বা বুঝা যায়। শারী'য়াতের পরিভাষায় যাদু হলো- এমন কিছু গিরা, কবচ, ঝাড়-ফুঁক, তেলেসমাতী ও তন্ত্র-মন্ত্রের নাম, যদ্বারা জিন বা শয়তানকে ব্যবহারের মাধ্যমে কারো ক্ষতি করার অপচেষ্টা করা হয়। সাধারণত যাদু মানুষের অন্তরে, মস্তিষ্কে কিংবা দেহের ভিতরে কাজ করে। তবে দেহের বাইরেও এর প্রভাব পড়ে থাকে। যাদু দু'টি কারণে শির্কের পর্যায়ভুক্ত।

প্রথমত: যাদুর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হারাম ও নিকৃষ্ট কাজের মাধ্যমে জিন ও শয়তানের সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও সাহায্য কামনা করা হয়। অথচ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নৈকট্য বা সাহায্য কামনা করা হলো সুস্পষ্ট শির্ক। এ ছাড়া যাদু হলো শয়তানের শয়তানী শিক্ষা।

দ্বিতীয়ত: এতে গায়িবের ইলম দাবি করা হয়। যাদুকর বা তার সাহায্যকারী জিন ও শয়তানরা নিজেকে গায়িব সম্পর্কে অবগত বলে দাবি করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউই গায়িবের জ্ঞান রাখে না। আল্লাহ্ বলেন: "(হে নবী!) আপনি বলুন, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আকাশে ও যমীনে যারা আছে তারা কেউই গায়িব জানে না।" (সূরা আন্ নাম্ল ২৭:৬৫) গায়িবের জ্ঞান হলো আল্লাহ্র একক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত কারো গায়িবের জ্ঞান দাবি করার অর্থ হলো আল্লাহ্র একক বৈশিষ্ট্যে অংশীদারিত্ব দাবি করা। আর এটাই হলো সুস্পষ্ট কুফ্র ও শির্ক।

গণকের নিকট হাত দেখিয়ে রাশি নির্ণয়, ভাগ্য নির্ণয়, কাউকে যাদু করা এবং মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুক করলে ইমান ভেঙ্গে যায়। যাদু সত্য, কুরআনের আয়াতে যাদুর উল্লেখ আছে বটে তবে যাদু কুফরী কাজ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ইহুদি মহিলা যাদু করেছিল। যার নিরাময়ের জন্য সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হয়। এই সূরার তিলাওয়াত ও ঝাড় ফুক যাদু-টোনা থেকে বাঁচার জন্য একটি কার্যকরী তাবিজ। কিছু মূর্খ লোক সুতায় ফুক দিয়ে গাঁট দেয় এবং রক্ষা তাবিজ হিসাবে বাচ্চাদের গলায় ঝুলায়। অথচ সূরা ফালাকে প্রতিদিন তিলাওয়াত করা হয়: "সেই অনিষ্ট থেকে (আশ্রয় চাই) যে নারীরা সুতার গিরায় ফুঁৎকার দেয়।" (সূরা ফালাক ১১৩:৪)। যাদু অবলম্বন করলে পরকালে তার কোন অংশ নেই বিষয়ে আল্লাহর বলেন: "তারা শিখত এমন কিছু যা তাদের ক্ষতি করত এবং কোন উপকার করতে পারত না। আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে পরকালে তার কোন অংশ নেই।

কতইনা নিকৃষ্ট তা যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করেছে, যদি তারা জানত।" (সূরা আল-বাকারা ২:১০২ অংশ)।

যাদুর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দু'টোই কুফরী। যাদুর আকর্ষণ হলো- অবৈধভাবে কোন নর-নারীর মধ্যে যাদু-মন্ত্র দ্বারা একজনকে অপরজনের প্রতি আকৃষ্ট করা। যাদুর বিকর্ষণ হলো- পরস্পরের মধ্যে বা মানুষকে তার আপনজনের প্রতি বিরাগভাজন, ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির অপচেষ্টা করা।

সুতায় গিট বেঁধে এর উপর ফুঁক দেয়া এবং শিশুদে গলায় পরিয়ে দেয়া যাকে বল রষ্কা বন্দি (রক্ষা তাবিজ), প্রকাশ্য শির্ক।

আবূ হুরায়রাহ (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি গিট বেঁধে এর উপর ফুঁক দিল সে যাদু করল। আর যে যাদু করল, সে শির্ক করল।" (ছুনানুন্ নাছায়ী)।

ইমাম আবু হানীফাহ (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম আহ্মাদ ইবনু হাম্বাল (রহ.) যাদু করাকে এবং যাদু শিক্ষাকে কুফ্রী বলে অভিহিত করেছেন।

মোটকথা, সাধারণত যাদুর মধ্যে মৌলিক যেসব বিষয় বা উপাদান থাকে সে গুলো হলো শির্ক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যাদুর মধ্যে ইমানের পরিপন্থি কথাবার্তা ও কাজকর্ম অবলম্বন করা হয়। তাই যাদু করা, যাদু করানো কিংবা যাদু শিক্ষা করা হলো কুফ্র ও শির্ক যা ইসলামকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করে দেয় এবং মুসলিমকে মুশরিকে পরিণত করে। যাদু এবং যাদুর সাথে সকল প্রকার সম্পৃক্ততা সম্পূর্ণরূপে পরিহার ও বর্জন করা, আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

ইমান ভঙ্গের অষ্টম কারণ:

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফের-মুশরিকদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা ইমান ভঙ্গ বা বিনষ্টের অন্যতম কারণ। কারন ইমানদারগণকে কাফির-মুশরিকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব না রাখার এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা না করার জন্য আল্লাহ্ কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন: কাফির-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণকারীগণ তাদেরই দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে ক্বোরআনে কারীমে বহু আয়াত বর্ণিত রয়েছে। "হে মু'মিনগণ, তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা আল মায়িদাহ ৫:৫১)। আল্লাহ্ বলেন: "অতএব (হে রাছূল!) আপনি কোন অবস্থাতেই কাফিরদের সাহায্যকারী হবেন না।" (সূরা আল ক্বাসাস ২৮:৮৬)।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন মুশরিককে সাহায্য-সহযোগিতা করার অর্থ হলো- আল্লাহ্ র সাথে, তাঁর রাসূল (ﷺ) ও মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং নিজেকে আল্লাহ্র ওয়া'দাকৃত 'আযাব ও গযবে নিপতিত করা। আল্লাহ বলেন:

"আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্যে যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই অতিশয় মন্দ। আর তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। যদি তারা আল্লাহ ও নাবীর প্রতি এবং তাঁর (নাবীর) প্রতি নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচারী।" (সূরা আল মা-য়িদাহ ৫:৮০-৮১)।

কাফির-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণ করা কিংবা মুসলিমের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা হলো মুনাফিক্বদের বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদেরকে আর্থিক, শারীরিক, মানসিক ও অন্যান্যভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, কিংবা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে নিঃসন্দেহে ইমান হারাবে। আল্লাহ্ বলেন: "সেসব মুনাফিক্বকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক 'আযাব, যারা মুসলিমদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয়। তারা (মুনাফিক্বরা) কি তাদের (কাফিরদের) কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে ? অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহ্রই জন্য। (সূরা আন্নিছা ৪:১৩৮-১৩৯)। আল্লাহ্ আরও বলেন: "যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ কারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ইমান সুদৃঢ় করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর তরফ থেকে অদৃশ্য রুহ দিয়ে। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নহরসমুহ প্রভাহিত হয়, সেথায় তারা অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাবই আল্লাহ্র দল। জেনে রেখ আল্লাহ্র দলই সফলকাম।" (সূরা মুজাদালা ৫৮:২২)। আল্লাহ্ বলেন: "তুমি কি তাদের দেখনি যাদের দেওয়া হয়েছিল কিতাবের এক অংশ, তারা ইমান রাখে জিব্ত ও তাগুতে এবং তারা কাফেরদের সন্মন্ধে বলে: এরাই মু'মিনদের চেয়ে অধিকতর সরল-সঠিক পথে রয়েছে।" (সূরা নিসা ৪:৫১)। এবিষয়ে আল্লাহ বাণী: "যারা ঘরে বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সন্মন্ধে বলল: তারা আমাদের কথামত চললে নিহত হত না, তাদের আপনি বলে দিন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও।" (সূরা আল-ইমরান ৩:১৬৮)।

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্” এই কালিমাহ্র অপরিহার্য দাবি হলো: আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য শুধুমাত্র ইমানদারগণের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা, তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক বজায় রাখা এবং কাফির-মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

ইমান ভঙ্গের নবম কারণ:

মুহাম্মদ (ﷺ)-এর শরিয়তের বাইরে অন্য শরিয়তে বিশ্বাস করলে ইমান ভেঙ্গে যায়। ব্যক্তি বিশেষের জন্য ইসলামী বিধান থেকে বের হয়ে যাওয়া বৈধ বলে মনে করা, কিংবা ব্যক্তি বিশেষকে ইসলামী বিধি-বিধানের উর্দ্ধে বলে মনে করা। অর্থাৎ- যদি কেউ এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, কোন লোকের জন্য আল্লাহর প্রবর্তিত এবং রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশিত বিধান থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া তথা ইসলামি শারী'য়াত অনুসরণ না করা জায়িয, কিংবা এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, এমন কতক ব্যক্তিবর্গ আছেন যাদের জন্য আল্লাহ্র বিধান প্রযোজ্য নয়, তাহলে তার ঈমান ও ইসলাম বিনষ্ট হয়ে যাবে। যেমনটি অনেক ভন্ড সূফী-সাধক ও বাত্বিল মা'রিফাতপন্থী লোক মনে করে থাকে।

এ জাতীয় 'আক্বীদাহ পোষণের অর্থ হলো যে, ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য তথা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আগত প্রতিটি বনী আদমের জন্য আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম নয় এবং শারী'য়াতে ইসলামের অনুসরণ ও অনুশীলন সকলের জন্য আবশ্যকীয় নয়, কিংবা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাত সর্ব সাধারণের জন্য সর্বজনীন রিসালাত নয়। এ ধরণের 'আক্বীদাহ-বিশ্বাস পোষণ করা ক্বোরআন ও সুন্নাহ্তে বর্ণিত সুস্পষ্ট প্রমাণাদী অস্বীকার করার নামান্তর।

অথচ ক্বোরআন ও ছুন্নাহ দ্বারা অকাট্য ও সুস্পষ্টরূপে একথা প্রমাণিত যে, ইসলামই হলো আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র সর্বজনীন দ্বীন এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) হলেন সমগ্র জগতের প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল। আল্লাহ্ বলেন:“নি:সন্দেহে ইসলাম হলো আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দ্বিন। . . . ” (সূরা আলে 'ইমরান ৩:১৯)। রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন: “আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।” (সূরা ছাবা ৩৪:২৮)। আল্লাহ্ বলেন: “বলুন: হে মানব জাতি! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল, যিনি সমগ্র আসমান ও জমিনের মালিক, যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ইমান আন আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি যিনি নিরক্ষর নবী, যিনি ইমান আনেন আল্লাহ্ প্রতি ও তাঁর বানীতে। তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে হেদায়াত প্রাপ্ত হও ” (সূরা আল আ'রাফ ৭:১৫৮)।

আবূ হুরায়রাহ (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রাছূল (ﷺ) বলেছেন: "আমাকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে এবং আমাকে প্রেরণের মাধ্যমে নাবুওয়্যাতের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করা হয়েছে।" (সাহীহ্ মুসলিম)।

আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে যে দ্বীন বা শারী'য়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা যথাযথভাবে গ্রহণ ও পালন করা এবং সর্বক্ষেত্রে রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য। কেননা ইসলামের বিধি-বিধান সর্বতোভাবে গ্রহণ ও পালন করা ব্যতীত এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন এবং ইহ-পরকালীন মুক্তি লাভের অন্য কোন উপায় নেই। কেউ যদি দ্বীনে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন পথ অনুসরণ করে তাহলে তা আল্লাহর নিকট আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না, বরং তা হবে প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ্ বলেন: "আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম তালাশ করবে, তবে সেটা কখনও তার থেকে গৃহীত হবে না। আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা আলে ইমরান ৩:৮৫)। রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন: "(হে নবী!) আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালোবাসবেন।" (সূরা আলে ইমরান ৩:৩১)। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন: "আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমুহ সংসোধন করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল।" (সূরা আল আহ্যাব ৩৩:৭১)। আল্লাহ্ আরো বলেন: "বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করো। বস্তুতঃ যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ কাফিরদিগকে ভালোবাসেন না।" (সূরা আলে 'ইমরান ৩:৩২)।

তাই কেউ যদি এ ধরনের কোন বিশ্বাস পোষণ করে যে, রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া অন্য কোন পন্থায় আল্লাহ্র পথে চলা বা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা সম্ভব, কিংবা এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, কোন লোক চেষ্টা-সাধনা বা আরাধনা করে অসাধারণ মর্যাদার আসনে পৌঁছে গেলে তার জন্য নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শারী'য়াত অনুসরণ করা জরুরী নয়, ফরজ কাজ ছেড়ে দেয়া এবং নানারকম পাপ কাজ করা জায়িয তথা বৈধ, যদি কেউ এরূপ কোন ধারণা-বিশ্বাস পোষণ করে, তাহলে তার ইমান ও ইসলাম বিনষ্ট হয়ে যাবে।

উম্মাতে মুসলিমের সকল ইমাম ও 'উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত অভিমত হলো যে, যে ব্যক্তি অকাট্য ও সন্দেহাতীত প্রমাণিত ক্বোরআন বা ছুন্নাহ্র একটি বিধানকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে রাসূল (ﷺ)-এর রিসালাতকে অস্বীকার করবে, তার হুকুম যে কি হতে পারে তা তো

খুব সহজেই অনুমেয়। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেছেন- যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, "মুহাম্মাদ এর শারী'য়াতের অনুসরণ হতে মুক্ত হওয়া কারো জন্য বৈধ" তার ইমান থাকবে না।
তিনি আরো বলেছেন- যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, "আল্লাহ্‌র কিছু খাস বান্দা আছেন যাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের কোন প্রয়োজন নেই", সে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগকারী; মুরতাদ এ বিষয়ে সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছে।
আল্লাহ কুরআনে বলেন: "যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করবে, কখনও তা তার থেকে কবুল করা হবে না; আর আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত। (আলে ইমরান ৩:৮৫)। আল্লাহ কুরআনে বলেন: "তারা কি একথা জানেনি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁর জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে। এটা বিষম লান্‌ছনা।" (সূরা তওবা ৯:৬৩)।

ইমান ভঙ্গের দশম কারণ:

আল্লাহর দ্বীনের শিক্ষা থেকে বিরত থাকা ও অনীহা করা ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া তথা দ্বীন ইসলামকে উপেক্ষা ও বর্জন করা। ইমান ও ইসলাম বিনষ্ট বা ভঙ্গের অন্যতম কারণ। ইসলামের মৌলিক ও অপরিহার্য বিষয়াদীর জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত থাকা। ইসলামী শারী'য়াত অনুযায়ী 'আমাল বা অনুশীলন না করা। ইসলাম যে সব বিষয় অবশ্য পালনীয় বলে নির্দেশ দিয়েছে সেগুলো পালন না করা এবং যে সব বিষয় অবশ্য বর্জনীয় ও হারাম ঘোষণা করেছে সে সবকে বর্জন না করা। দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়াদী সম্পর্কে জানার জন্য কোনরূপ প্রচেষ্টা না করা, কিংবা ধর্মীয় মৌলিক শিক্ষা অর্জন করার প্রতি কোনরূপ প্রয়োজন ও আগ্রহ না করা। বরং শারী'য়াত ও ইসলামের চর্চা ও অনুশীলন থেকে দূরে থাকা এবং দ্বীন তথা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বা জাহিল হয়ে থাকাতে খুশি ও সন্তুষ্টি বোধ করা। আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন ও অমান্য করাকে কোনরূপ তোয়াক্কা বা পরওয়া না করা এবং আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মেনে চলাকে আদৌ গুরুত্ব না দেয়া। এসব কার্যকলাপ স্পষ্টতো এটাই প্রমাণ করে যে, এ রকম লোক মুখে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বললেও মনে-প্রাণে সে এ কালিমাহ্‌কে স্বীকার করছে না, বরং সে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে উপেক্ষা ও বর্জন করছে এবং কার্যতঃ আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আল্লাহ্‌ র দ্বীন শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ও ধর্ম বিমুখতা অবলম্বন করা একটি অপরাধ। এবিষয়ে আল্লাহ্‌ বলেন: "ঐ ব্যক্তির চাইতে অধীক জালিম কে, যাকে তার রবের আয়াতসমুহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমি অবশ্যই অপরাধীদের শাস্তি দেব।" (সুরা সাজদা ৩২:২২)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন: "বলুন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো। বস্তুতঃ যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ কাফিরদিগকে ভালোবাসেন না।" (সূরা আলে 'ইমরান ৩:৩২)।

যারা মুখে ইমানের কথা বলে কিন্তু কাজে তা প্রতিফলিত করে না, অর্থাৎ ইসলামী শারী'য়াত অনুযায়ী 'আমাল করে না, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন: "তারা বলে, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমরা আনুগত্য করি, কিন্তু তাদের মদ্য থেকে একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; আসলেই তারা মু'মিন নয়।" (সূরা নূর ২৪:৪৭)। অতএব যে ব্যক্তি শারী'য়াতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ব্যতীত দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদীর জ্ঞান অর্জন থেকে এবং তদনুযায়ী 'আমল করা থেকে বিরত থাকবে, তার ইমান ও ইসলাম বিনষ্ট হয়ে যায়। সঠিক দ্বীনের শিক্ষা বিষয়ে অনেক উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যাদের দ্বীনের শিক্ষাই নেই তারা আবার ইমান ভঙ্গের কারণ জানবে কি করে ? **ইমান ভঙ্গের আরও কারণ:** রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনুগত্য থেকে বিমুখ হলেও ইমান ভেঙ্গে যায়। আল্লাহ বলেন: "ওহে যারা ইমান এনেছ। তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের এবং যখন তাঁর কথা শুনছ তা থেকে বিমুখ হয়ো না।" (সূরা আন-ফাল ৮:২০)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে খেয়ানত না করার জন্য আল্লাহর বাণী: "ওহে যারা ইমান এনেছ। তোমরা জ্ঞাতসারে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত কর না এবং নিজেদের আমানতের ব্যাপারে খেয়ানত কর না।" (সূরা আন-ফাল ৮:২৭)। ইমান ভঙ্গের আরও অনেক কারণ আছে যা হাদীস থেকে পাওয়া যায়। ইমানের উপর স্থির থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রথম দুয়া করা যেতে পারে: "হে আমাদের রব! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের রবের প্রতি ইমান আন; তাই আমরা ইমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দুর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে।" (সুরা আলে-ইমরান ৩:১৯৩)। ইমানের উপর স্থির থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকট দ্বিতীয় দুয়া করা যেতে পারে: "আমার বান্দাদের একদলে বলতঃ হে আমাদের রব! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (সুরা মু'মিনুন ২৩:১০৯)।

সাধারণ জ্ঞান ১২. মাজহাব পরিচিতি ও শিয়া-মতবাদ।

মাজহাবের সুচনা ও পরিচয়: মাজহাব হচ্ছে কতিপয় মাসয়ালা-মাসায়েলের ব্যাপারে ওলামাদের মতামত, অনুধাবন ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান। গবেষণা ও মতামতের মধ্যে ভুল শুদ্ধ উভয় সম্ভাবনা থাকতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এই জ্ঞান, গবেষণা এবং

মতামতের অনুসরণ করাকে অপরিহার্য করেন নি। বরং রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) হতে যা প্রমানিত এবং সাহাবাগণ যা বাস্তবায়ন করেছেন সেটাই নির্ভুল এবং নিরাপদ। গায়েবের বিষয় মুল আকিদা, কুরআন ও সহীহ্ হাদিসে যতটুকু বর্ণিত আছে হুবহু তাই বিশ্বাস করতে হবে। ইবাদতের পরিমান বিষয়ে কিছু ভিন্ন মত থাকতে পারে।

মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ওফাতের পর ১০ হিজরি থেকে ৪৫০ হিজরি পর্যন্ত কোন মাজহাব ছিল না। সাহাবাগণ, তাবীঈ, তাবে-তাবীঈ এবং ইমামগণ সকলেই কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসারে ধর্ম-কর্ম পরিচালনা করেছেন। আরবি 'ইযহাব' অর্থ যাওয়া বা পথ চলা এবং মাজহাব হচ্ছে চলার পথ বা পদ্ধতি। বিভিন্ন আলেমগণ সহীহ হাদীসের নানা গবেষণার পর তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা বা ফিক্হার উপর বই লেখেন যেন, দ্বীন ইসলামের উপর চলার পথ সহজ করা যায়। এরপর কিছু কিছু আলেম ইমামগণের মতামত চূড়ান্তভাবে অনুস্বরণ করতে গিয়ে মাজহাবের সৃষ্টি হয়। ইমামগণ সহীহ হাদীস অনুসরণ করতেন তবে হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষনে কিছু মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়।

মত পার্থক্য আল্লাহ্র পরীক্ষা। আল্লাহ্ বলেন-"আর যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে অবশ্যই তিনি তোমাদের সবাইকে একজাতি করে দিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার মাধ্যমে।" (সূরা আল-মায়িদা ৫:৪৮)। ধর্ম পালনে কোন বাড়াবাড়ি না করলে মাযহাবে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ ফরজ ওয়াজিবে তেমন ইখতিলাফ নেই। সুন্নত ও মুস্তাহাব আমলের কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবু-হানিফা (রহ.) বলেছেন "যখন কোন হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হবে, ঐ সহীহ হাদীসই আমার মাজহাব।"

আকিদা বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের অনুসরণ করতে হবে। ইবাদতের বিষয়ে কোন একটি মাজহাব মেনে চলতে হবে এমনটি বাধ্যতামুলক নয়। যে কোন ইমাম থেকে মাসয়ালা-মাসায়েল নেওয়ার স্বাধীনতা সব মুসলিমের আছে। আমল ও ইবাদতের পার্থক্য নিয়ে দলাদলি করা ভাল নয়। যে কোন মাজহাবের আলেম যার দ্বীন বিষয়ে ভাল জ্ঞান আছে এবং আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাকোওয়া অবলম্বন করে, তাকে দ্বীনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। যেমন আল্লাহ্ বলেন: "আমি আপনার পূর্বে মানুষকেই ওহীসহ প্রেরন করেছি। অতএব তোমরা জ্ঞানীদেরকে গিজ্ঞেস কর। যদি তোমরা না জান।" (সূরা নাহ্ল ১৬:৪৩)।

চার মাজহাব প্রসিদ্ধ থাকলেও আরও মাজহাব আছে। কুরআন ও সহীহ-হাদীসের অনুসরণ করে চলে এমন মুসলিম জনসংখ্যাও কম নয়। **চার মাজহাবের ইমামগনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।**

(১) হানাফি মাজহাবের ইমাম নোমান বিন সাবিত বিন জুতি (আবু হানিফা) (রহ.)। ইরাকের কুফা নগরে জন্ম-মৃত্যু (৮০-১৫০) হিজরি, কবর বাগদাদে। তাঁর লিখিত ফিক্হার বই "আল ফিক্হুল আকবর"। বাংলা অনুবাদক ডঃ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর।
(২) মালিকী মাজহাবের ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস (রহ.)। মদিনায় জন্ম-মৃত্যু (৯৩-১৭৯) হিজরি, কবর মদিনাতে। তাঁর লিখিত ফিক্হা "মুয়াত্তা মালিক" সহ অনেক বই রয়েছে।
(৩) শাফী মাজহাবের ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আল-শাফী। মিসরের আসকালণায় জন্ম-মৃত্যু (১৫০-২০৪) হিজরি, কবর কায়রোতে। তিনি শতাধিক বই লিখেছেন।
(৪) হাম্বলি মাজহাবের ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইরাকের বাগদাদে জন্ম-মৃত্যু (১৬৪-২৪১) হিজরি, কবর বাগদাদে। তাঁর লিখিত ফিক্হার বই "মুসনাদে আহমাদ"।
বিভিন্ন প্রকার ইমাম বলতে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। যেমন:
(ক) যারা কুরআনের তাফসীর লিখেছেন তারা হলেন “তাফসীরের ইমাম”।
(খ) যারা হাদীস সংগ্রহ করেছেন তারা হলেন “হাদীসের ইমাম”।
(গ) যারা ফিক্হা লিখেছেন তারা হলেন “ফিক্হার ইমাম”।
(ঘ) যাদের নামে মাজহাবের সৃষ্টি হয়েছে তারা হলেন “মাজহাবের ইমাম”।
(ঙ) যার মসজিদে ইমামতি করেন তাদেরকে “মসজিদের ইমাম” বলা হয়।

ইতিহাসে দেখা যায় শত শত বছর পারশ্য ও ইউরোপীয় শাসকগণ ভারত শাসন করেছে। কিন্তু কেউই ভারতীয় মুসলিমদের আরবি ভাষায় লেখা পড়া শিক্ষার তেমন চেষ্টা করেনি। পারশ্য শিক্ষকগণ সংক্ষেপে আরবি ভাষার বর্ণপরিচয় শেখাতো, যাতে করে মুসলিগণ কুরআন তেলাওয়াত এবং কুরআন হিফ্জ করতে পারে। আর এই সুজুগে ফার্সি বর্ণমালা আরবির সাথে মিল থাকায় তারা ফার্সি ভাষার বই পুস্তক পড়া শিক্ষা দিত। ভালোমত আরবি ভাষা শিক্ষা না দেওয়ায় শিক্ষকগণ যা তরজমা করে দিত তাই ভারতীয় মুসলিগণ শিখত। ধর্মীয় পূর্ণ জ্ঞান ও গবেষনার অভাব থাকায় কুরআন ও সহীহ-হাদিসের সত্যের সাথে মানব রচিত সূভিবাদ ও দর্শন শাস্ত্রের যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি সংমিশ্রণ হয়ে যায়। এই ধরনের কিছু শিক্ষিত মুসলিম সাধারণ জনগণকে একটি নির্ধারিত এলাকার মধ্যে একত্রিত করে মৌখিক শিক্ষা-দিক্ষার ব্যবস্থা করতো। এভাবে লোকজন ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয়ে যায়। কুরআন হদিসের লিখিত অনুবাদ না থাকায় আসল শিক্ষা পায় না। শিক্ষা দেয়া হয় মানব রচিত সূভিবাদ ও দার্শনিকের মনগড়া ইমান ও আমলের বিষয় যা মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়ে আছে।

শিক্ষকগণের ধর্মীয় ভাষা ছিল ইরানের ফার্সি, ফলে অনেকের নিকট তেমন বোধগম্যও ছিল না। প্রয়োজনীয় কর্ম ও শিক্ষার পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় কর্ম ও শিক্ষায় শিক্ষিত হত। বৃটিশ বিদায় হয়েছিল কিন্তু তাদের উত্তরশুরী এবং আইন কানুন আমাদেরকে উপহার দিয়ে গিয়েছিল। এখনও আমরা তাদের দেয়া আইন কানুন এবং ধর্মীয় বিধি বিধান উত্তআরাধিকার সুত্রে পেয়েছি এবং তা মেনেই চলছি। বর্তমান উনমুক্ত বিশ্বে প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সহজ হয়েছে। কুরআন, হাদিস, ফিকহ্ এবং ইসলামের ইতিহাসের বাংলা অনুবাদ বইগুলি সহজেই পাওয়া যায়। সত্য সন্ধান সহজ হয়েছে। সন্ধানের জন্য চেষ্টা চলছে এবং পরিবর্তনও শুরু হয়েছে। পাক-ভারত বিভক্ত হয়েছে ১৯৪৭ সনে, পাকিস্তানও বিভক্ত হয়েছে ১৯৭১ সনে, সেখান থেকে যুদ্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। এখানে মুসলিমদের মধ্যে যে সব ধর্মীয় ইবাদতে পার্থক্য এখনও দেখা যায় তার কারণ কি ? অনুসন্ধানে অনেক কিছুর মধ্যে এটিও একটি যে, শিক্ষিত ও প্রসিদ্ধ পন্ডিত এবং তাদের ঘনিষ্ঠ অনুসারীগণের মাধ্যমে মুসলিমগন মাজহাবের মধ্যেও নানা উপদলের অনুসরণ করছে। তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল:

(১) মুহাম্মদ কাসিম নানাতাভি জন্ম ভারতে (১৮৩২-১৮৮০)খৃষ্টাব্দ / (১২৪৮-১২৯৭)হিজরি। তিনি দেওবন্দী মুভমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন। তার অনুসারীগণ নিজেদেরকে 'দেওবন্দী' মনে করেন।

(২) মীর্জা গুলাম আহমেদ কাদিয়ানী জন্ম পাকিস্থানে (১৮৩৫-১৯০৮)খৃষ্টাব্দ / (১২৫১-১৩২৬)হিজরি। তিনি আহমদীয়া মুভমেন্ট বা কাদিয়ানী ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। তার অনুসারীগণ নিজেদেরকে কাদিয়ানী বা আহমদী দাবী করেন।

(৩) আহমেদ রেজা খান জন্ম ভারতে, (১৮৫৬-১৯২১)খৃষ্টাব্দ / (১২৭২-১৩৩৯)হিজরি। তিনি সূফি ও উর্দু কবি এবং ব্রেলভী মুভমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তার অনুসারীগণ নিজেদেরকে 'ব্রেল্ভী' দাবী করেন।

(৪) মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধলয়ী জন্ম ভারতে (১৮৮৫-১৯৪৪)খৃষ্টাব্দ / (১৩০২-১৩৬৩)হিজরি। তিনি তবলীগ জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। তার অনুসারীগণ নিজেদেরকে ‘তাবলীগ জামাতী’ মনে করেন।

(৫) সাইদ আবুল আলা মাউদুদি জন্ম ভারতে (১৯০৩-১৯৭৯)খৃষ্টাব্দ / (১৩২১-১৩৯৯)হিজরি। তিনি জামাতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। তার অনুসারীগণ নিজেদেরকে ‘জামাত ইসলামী’ মনে করেন।

এই মনীষীগণ সাবাই ভারত বর্ষে বৃটিশ শাসনের সময় (১৭৫৭-১৯৪৭)খৃষ্টাব্দ/ (১১৭০-১৩৬৬)হিজরি। জন্ম গ্রহণ করেন এবং ধর্মীয় নেতা হিসাবে প্রশিদ্ধ লাভ করেছিলেন। বৃটিশের একটি প্রসিদ্ধ ফরমুলা ছিল। Devide & Rule অর্থাৎ বিভক্ত কর এবং শাসন কর। এই মনীষীগণ ধর্ম কর্ম যে যাই করে থাকুন সেটার ভাল মন্দ আমি

বলছি না, তবে মুসলিমদের মধ্যে যে বিভক্তির সৃষ্টি করা হয়েছিল তা এখনও প্রচলিত আছে।

এছারা লক্ষ লক্ষ তরীকা পন্থিদের ভিন্ন ভিন্ন তরীকা, যার একের সাথে অন্যের মিল নেই ফলে দ্বীন খন্ড বিখন্ড হয়েছে। আল্লাহ্ কুরআনে সাবধান করে বলেন: "নিশ্চয় যারা নিজেদের দ্বীনকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সংশ্রব নেই। তাদের বিষয় আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত। তারপর তিনি জানিয়ে দিবেন যা তারা করত।" (সূরা আন'আম ৬:১৫৯)।

এখন মুসলিমদের করণীয় কি? ভিন্ন ভিন্ন মতের আদর্শ অনুসরণ না করে ,কুরআন ও হাদিস অনুযায় আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদেশ নিষেধ মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। ছোট ছোট ইবাদত, মাসলা-মাসায়েলের মতভেত, আচার-আচরণের ভিন্নতা নিয়ে ধর্মীয় দলাদলিতে জাতীয় ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। জাতীয় কবি কাজী নজরল ইসলাম এ ধরনের বিভক্তির বিরুদ্ধে লিখছেন:

"হুকার জল আর ভাতের হাঁড়ি ভাবলি এতেই জাতীর জান,
তাইত তোরা একজাতীকে করলি ভেঙ্গে একশ খান।"

এরূপ কত বিভাজন আছে তা আল্লাহ্ ভাল জানেন। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন: "আপনি বলুন: আমার সালাত, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন রাব্বিল আলামিনের জন্যে।" (সুরা আন'আম ৬:১৬২)। কুরআন ও সহীহ্-হাদিস অনুসারে আল্লাহ্র উপর পূর্ণ বিশ্বাস করে কম আমল করেও সহজে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব ইন্শা আল্লাহ্।

শিয়া-মতবাদ (Shiaism):

শিয়া সম্প্রদায় নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করলেও উপরের কোন সুন্নি ইমামকে তারা ইমাম মানে না। প্রথম ১০ জন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত (আশারা মুবাশ্শার) সাহাবার মধ্যে একমাত্র আলী (রাদি.) ছাড়া অন্য সবাইকে কাফের ফতোয়া দেয়। শিয়াগণ বিশ্বাস করে যে, আলী (রাদি.) ও তার বংশের ইমামগণ সাধারণ মানুষ নয়। বরং তারা নুরের তৈরি এবং গাইবী-অলৌকিক ইল্ম ও ক্ষমতার অধিকারী। শুধু তাদের ইমামদের নামে এ দাবী করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, সেজন্য তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামেও এরূপ দাবি এবং প্রচার করে থাকে, তিনিও নুরের তৈরি এবং গাইবী ইল্ম ও ক্ষমতার অধিকারী (নাউজু বিল্লাহ)। মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ কুরআন এবং সহীহ-হাদীস শিয়ারা অনুসরণ করে না। মক্কা ও মদিনার কোন সাহাবাকেই শিয়ারা মানে না ও সম্মান করে না। তারা শুধু পারস্য দেশের নির্ধারিত

ইমাম, সূফি, পীর ও বুযুর্গদের মনগড়া কিচ্ছা, কাহিনী, পদ্ধতি ও দলিল বিহীন কিয়াসকেই তাদের ধর্ম মনে করে। ইসলাম ধর্মের মূল উৎস আল্লাহর কুরআন, মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সহীহ-হাদীস, সাহাবাদের ইজমা ও কেয়াসের সম্পুর্ণ পরিপন্থী মতবাদই তাদের শিয়া-ধর্ম। ইরানে শিয়াগণের আধিক্য, যাদের ভাষা ফার্সি এবং তাদের ধর্মীয় বই পুস্তকও ফার্সি ভাষায় লিখিত আছে। মোগল শাসন থেকে ভারতে শিয়া মতবাদের গোড়া পত্তন হয়। এর প্রভাব বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয় বিভক্তির কারণও বটে।

শিয়াদের ভ্রান্ত দাবী যারা মানে না তারা 'কাফির'। এই আখ্যা দেওয়াকে সাধারণত "তাকফীর" বলা হয়। মুসলিম উম্মার মধ্যে প্রকাশিত খারিজী ও শিয়া ফিরকার আকীদার প্রথম বিভ্রান্তিগুলোর অন্যতম ছিল "তাকফীর" বলা। পাপের কারনে বা মতভেদীয় বিষয়ে ভিন্ন মতের কারনে অর্থাৎ শিয়াদের মতামত যারা মানে না এমন মুসলিম ও মু'মিনকেও তারা কাফির বলে। "তাকফীর" প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা বলেন: "আমরা কোনো মুসলিমকে কোনো পাপের কারনে কাফির বলি না, যদিও তা কোনো কবীরা গোনাহ্ হয়, যতক্ষন না সে ব্যক্তি উক্ত পাপটিকে হালাল বলে বিশ্বাস করে। আমরা পাপের কারনে কোনো মুসলিমের 'ইমান'-এর নাম অপসারণ করি না। বরং আমরা তাকে প্রকৃত মু'মিন বলে আখ্যায়িত করি, সে কাফির না হয়ে একজন পাপী মু'মিন হতে পারে।"

বিভ্রান্ত শিয়া গোষ্ঠী অসংখ্য ফিরকা ব দল ভিত্তিক আকীদা ও মতভেদের কারনে নানা উপদলে বিভক্ত হয়েছে। যেমন: জাফারিয়, ইমামিয়াহ্, আলামিয়াহ্, আলাভিয়া, জাহামিয়াহ্, সালিহিয়াহ্, শাম্মারিয়াহ্, ইউনুসিয়াহ্, সাওবানিয়হ্, নাজ্জারিয়াহ্, গাইলানিয়াহ্, শাবীবিয়াহ্, মুআযিয়াহ্, মারীসিয়াহ্, কার্‌রামিয়াহ্। আশারীয়া, মাতুরিদী, মুতাযিলী, মুরজিয়্যাহ ইত্যাদি। শিয়ামতবাদের পক্ষে বিপক্ষে হাজার বই লেখা হয়েছে। আল্লাহ্ ইসলাম ধর্মকে বিভক্ত করতে নিশেধ করে তাঁর বাণীতে বলেন: "যারা তাদের ধর্মকে খন্ডবিখন্ড করে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ অনুসৃত পন্থার উপর গর্বিত-উৎফুল্য।" (সূরা রুম ৩০:৩২)।

সাধারণ জ্ঞান ১৩. সূফিবাদ ও দ্বীণ ইসলাম।

দ্বীন ইসলাম আল্লাহ্ প্রদত্ত, আর সূফিবাদ মানব রচিত মতবাদ এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী ভিন্ন মতবাদ। ইতিহাসে দেখা যায়, কিছু অতি উৎসাহী ধার্মিক লোক সংসার ত্যাগ করে শুধু ইবাদত করার প্রত্যয় নিয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের সেই সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেনি। ইবাদতের বিষয় ও পদ্ধতি নিয়ে শুরু থেকে বিতর্ক রয়েই গেছে। নানা ধর্ম থেকে সংগৃহীত প্রচলিত পদ্ধতির সংমিশ্রণে এই সূফিবাদ।

সূফীগণ ইবাদত ও আত্মশুদ্ধির জন্য কুরআন সুন্নার বিধান বাদ দিয়ে মানুষের কল্পিত কাশ্‌ফ, মুরাকাবা-মুশাহাদার আশ্রয় নিতে শুরু করে। কুরআন সুন্নার অধ্যয়ন ত্যাগ করে বিভিন্ন মতবাদ অবলম্বন করার ফলে সুফীবাদের মধ্যে ইউনানী, পারস্য, বৌদ্ধ, সোনাতন ও অন্যান্য ধর্মের দর্শন যুক্ত হয়। এ ছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। মুসলিমদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে শিয়া, খারেজী, মুতাজিলা, কাদরীয়া, আশায়েরা, জাহমেয়ী এবং অনেক বাতিল ফিরকা ও মতবাদ। এরই ধারাবাহিকতায় 'সূফিবাদ' একটি ধর্মীয় মতবাদ হিসাবে ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। অগণিত মানুষ মানুষের দাসে পরিণত করে কিছু চালাক, অলস, অকর্মণ্য লোক বাকী জনগোষ্ঠিকে বোকা বানিয়ে নিজেরা আরামে রোজগার ও ভোগ বিলাস করে চলছে। এটা এমন এক ব্যবসা যার কোন পুজি লাগে না, কর্মচারীর বেতন দিতে হয় না, এমনকি সরকারি লাইসেন্স লাগে না এবং ট্যাক্সও দিতে হয় না। শুধু কিছু এজেন্ট নিয়োগ করে নিজেদের বুযূর্গ, বাতিনী শক্তি কেরামতির মিথ্যা প্রচার করে সরলপ্রান কুরআন-হাদীস বিমুখ মুসলিমকে ধোকা দিয়ে মিথ্যা প্রচার করে থাকে। তারা বলে, সবাই পাপী তাই পীর-বুযূর্গ ধরা ছাড়া ইবাদত বন্দিগীতে কাজ হবে না। আরও মিথ্যা প্রচার করে, পীর-বুযূর্গ ধরলেই দুনিয়াতে ধনী হওয়া যাবে। মৃত্যুর পর পীর-বুযূর্গ সুপারিশ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে স্বর্গে যাবে নিয়ে যাবে।

সূফিদের এরূপ পদ্ধতি মানব জাতির জন্য একটি ভয়াবহ ভাইরাসের মত। যারা এর ফাঁদে পরেছে তারা সর্বসান্ত হয়ে দ্বীন ও দুনিয়া সবই হারিয়েছে। জনগণকে কুরআন-হাদীস হতে ধর্মীয় শিক্ষা বঞ্চিত করে নিজেদের মন গড়া কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, ইসলাম অনুমোদিত নয়।

সুফীবাদের পরিভাষায় সূফী শব্দটি (صُوْفٌ সূফ) অর্থ পশম থেকে উৎপত্তি হয়েছে। কারণ হিসাবে বলা হয় পূর্ব জামানায় সাধারণ জীবন যাপনের অংশ হিসাবে সুফীগণ সস্তা পশমী কাপড় পরিধান করত। বাংলাদেশের সাধারণ ধর্মভীরু মানুষ ধারণা করে: সূফী তারা যাদের মুখে লম্বা দাড়ি আছে, হাতে তাসবীহ আছে, মিথ্যা বলে না, মানুষকে ধোকা দেয় না। মানুষের সাথে তেমন সম্পর্ক রাখবে না, মানুষের উপকার-অপকার, ভাল-মন্দ কিছুই করবে না। তারা শুধু আল্লাহ বিল্লাহ করবে; চাই তা কুরআন ও সহীহ-হাদীস মোতাবেক হোক বা না হোক। সমাজে এদেরকেই সাধারণত 'সূফী' বলা হয়।

সূফিদের মধ্যে যাহেল সূফি ও আলেম ফূফি আছে। যাহেল সূফীকে আমাদের দেশে অনেক নামে ডেকে থাকে। বাউল, ফকির, দরবেশ, সাধু, সন্যাশী, সাধক, ইত্যাদি। তারা নিজেদের মুসলমান হিসাবে দাবী করে থাকে। তাদের পোশাক আশাক ও

ইবাদত-বন্দেগী কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক হোক বা না হোক সেটা দেখার বিষয় নয়। তাদের কথার মধ্যে শালীনতা আছে; অনেক যুক্তিপূর্ণ গান, কবিতা ও কাহিনী প্রচার করে। স্বভাব নম্র-ভদ্র এবং কারো কোন ক্ষতি করতে দেখা যায় না। তারা কেহ কৃষি কাজ করে, কেহ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর পথ বেছে নেয়। গান বাজনার মাধ্যমে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। কেহ স্বাভাবিক পোশাক পরে, কেউ লম্বা গেরুয়া লাল পোশাক পরে থাকে। কেউ মেয়েদের মত লম্বা চুল ও দাঁড়ী রাখে। কেহ চুল ও দাঁড়ীতে জটলা পাকায়। হাতে ও গলায় কিছু পাথর মালা পরে থাকে। তারা অতি সাধারণ কিছু বাদ্য যন্ত্র দ্বারা হৃদয় গলান তাত্ত্বিক গান গেয়ে থাকে। এই তাত্ত্বিক গানের মোহে পরে অনেক মানুষের হৃদয় গলে যায় এবং অজান্তে নিজেদের ইমান হারায়।

এভাবে মন গলান গান, নানা সুরের বাজনা, যুক্তি তর্কের মাধ্যমে অনুপ্রানিত ও বিভ্রান্ত করে সাধারণ মুসলিমের মনে আস্তে আস্তে শির্ক ও মুনাফিকের বীজ ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে। 'যাহেল সূফীরা' সত্য ধর্মকর্ম জানেও না মানেও না, তবে সহজেই অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারে। ইরান থেকে আগত ভারতের সম্রাট হুমাইয়ুনের পুত্র আকবর ১২ বছর বয়সের অশিক্ষিত কিশোর দিল্লির সিংহাসনে বসে। তার দেখা শুনার ভার ছিল ইরানী কট্টর রাফেযি শিয়া 'বৈরাম খানের' উপর; সে বাতিনী শক্তির দাবিদার ছিল। সম্রাট আকবর 'দ্বীনে এলাহী' নামে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেছিল বটে তবে ভারতবাসী তা গ্রহণ করেনি। উপরন্ত ভারতীয়গণ তাদের সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ শুরু করে। তা রোধ কল্পে ভারতের শ্রী চৈতন্য নামের এক সাধকের উদ্ভব হয়। যার দর্শনে ও গানের মোহে পরে নদীয়ার মুন্সী আব্দুল্লা, বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে এবং 'জবান-হরিদাস' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। গান বাজনা কবিতা পাঠের মাধ্যমে হিন্দু ও শিয়া দর্শন থেকে বাউল-সূফীদের প্রচার শুরু হয়। বাউল থেকে গুরুবাদ, সাঁইবাদ ইত্যাদি অনেক উপবাদের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ বাউল: ফকির লালন শাহ, সিরাজ সাঁই, হাছন রাজা ইত্যাদি। ভারতবর্ষে সূফীবাদের উৎপত্তি হয় পারস্য তথা ইরান ও তুর্কি থেকে। কোন আরব দেশে এই ধরণের ভ্রান্ত শিরেকি মতবাদের উৎপত্তি পাওয়া যায় না।

গুরুবাদি সূফী: ভক্তরা বিশ্বাস করে যে কিবলা, ক্বাবা, আল্লাহ, রাসূল, সবকিছু গুরুর মধ্যে।

সাঁইবাদী সূফী: মোগল শিয়াদের সময় থেকে ভারতবর্ষে সাঁইবাদীর উৎপত্তি দেখা যায়। সাঁইকে তারা ভগবান হিসাবে প্রতি বছর পূজা দিয়ে থাকে।

দেহবাদী সূফী: লালন ফকির দেহের উপর অনেক গান রচনা করেছে, যাকে দেহ-তত্ত্ব বলা হয়। . . . এই দেহের ভেতরেই তোর কা'বা, গয়া কাশী বৃন্দাবন। তাদের ধারনা দেহের মধ্যে সব কিছুর জ্ঞান আছে।

পাকপাঞ্জা সূফী: ইরানের শিয়াদের এক অংশ পাক পাঞ্জাতনে বিশ্বাস করে। হাতের পাঞ্জায় পাঁচ আংগুলের ছবি তাদের ধর্মীয় প্রতীক যা বিভিন্ন খানকা, মাযারে পাওয়া যায়। তাদের বিশ্বাস তাদের খোদা দুনিয়াতে এসেছে পাঁচ রূপে। মুহাম্মদ, আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসাইন। এই পাঁচ জন মিলে 'পাকপাঞ্জা' ভ্রান্ত বিশ্বাসের সৃষ্টি।

শিক্ষিত সূফী: অত্যান্ত দুঃখের বিষয় কিছু অল্প শিক্ষিত আলেম সমাজের সাথে যাহেল-সুফীদের মিল আছে। কুরআন হাদীস পড়ুয়া মুফতি সার্টিফিকেট ধারী মাদ্‌রাসা থেকে জুব্বা, পাগড়ী ধারন করে এ ধরনের সুফীবাদ প্রচার করে থাকে। বাউল, সাঁইবাদী, গুরুবাদী, দেহবাদী, ন্যাড়ার ফকির, যে যাই বলে ও করে মুলত তারা একই মতবাদে বিশ্বাস করে। বিভ্রান্ত 'সুফীবাদী আলেম সমাজ' অনেকটা এরূপ কথাই বলে। যেমন: পড়া শুনা করে যত ইলেম হাসিল কর না কেন পীর-মুর্শিদের কাছে মুরিদ না হওয়া পর্যন্ত তোমার কোন কিছুই শুদ্ধ হবে না। এই আলেম সমাজ সুফী-পীরবাদীদের সাথে এই ন্যাড়া ফকিরদের কথায় পার্থক্য নেই। সূফীইজম একটি মাত্র প্লাটফর্ম মনে হলেও বহু তরীকা বা দলে বিভক্ত।

১। **কাদেরিয়া তরীকা**। আব্দুল কাদের জিলানীর নাম অনুসারে। ইরাকের বাগদাদে। জন্ম ৪৭১ হিজরি এবং মৃত ৫৬১ হিজরি বাগদাদে।

২। **চিশতিয়া তরীকা**। খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি অনুসারে। আফগানিস্থানের হেরাতে। জন্ম ৫৩৬ হিজরি এবং মৃত ৬২০ হিজরি ভারতের আজমীরে।

৩। **সোহরাওয়ারদী তরীকা**। শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ারদীর অনুসারে।
ইরানের সোহরাওয়ারদীতে। জন্ম ৫৩৬ হিজরি এবং মৃত ৬৩২ হিজরি সিরিয়ার আলেপ্পো।

৪। **নকশবন্দীয়া তরীকা**। মুহাম্মদ বাহা উদ্দিন নকশবন্দী অনুসারে। উজবেকিস্থানে। জন্ম ৫৩৬ হিজরি এবং মৃত ৭৯১ হিজরি। উজবেকিস্থানে।

৫। **মুজাদ্দেদীয়া তরীকা**। মুজাদ্দেদে আলফে ছানী অনুসারে। শেখ আহমেদ সেরহিন্দ আল-ফারুকী। জন্ম ভারতের পাঞ্জাবে। ৯১১ হিজরি এবং মৃত ১০৩৩ হিজরি। ভারতের ফাথেহপুরে।আরও তরীকা আছে। যেমন রেজভী তরীকা। শামেলী তরীকা। মাইজ ভান্ডারী তরীকা। সূফী পীরের বই পাঠ করলে দেখা যায় অগণিত তরীকা আছে যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

পীরের উৎপত্তি কোথা থেকে ? গবেষণায় দেখা যায় প্রথম পীরের উৎপত্তি স্থান পারস্য সম্রাজ্য থেকে এবং পরিভাষাও ফার্সি ।

পীরের উৎপত্তি কিভাবে?

(১) সিলসিলা পদ্ধতি: কেউ যে কোন ভাবে একবার পীর হতে পারলে তাঁর বংশধর সবাই পীর হতে পারে ওয়ারিশ সুত্রে। এর জন্য তেমন কোন যোগ্যতার দরকার নেই। অর্থাৎ উত্তরাধিকার হিসাবে যেমন ভাগীদার হয় তেমনি পীরের ছেলে পীর হয়। (২)

বেলায়েত প্রাপ্ত পদ্ধতি: বেলায়েতের দাবি ও প্রমান করলে পীর হতে পারে। (৩) গদীনসীন পদ্ধতি: যে কোনভাবে একবার পীরের গদী দখলে নিতে পারলে পীর হতে পারে। (৪) খিলাফত পদ্ধতি: মুরিদের মধ্যে যারা বেশী ভক্তি ও নজর-নেওয়াজ দিতে পারে তারা খিলাফত (Agency) পেয়ে পরবর্তিতে পূর্ণ পীর হওয়ার দাবি করে থাকে। (৫) রসমী পদ্ধতি: উচ্চ বংশের যেমন আওলাদে রাসূল, খন্দকার, সৈয়দ, আল-হোসাইনী, আল-হাসাইনী দাবিদার ব্যক্তিগণ 'পীর' হওয়ার দাবি করে থাকে।

প্রচলিত সূফিদের কতিপয় বিভ্রান্তিকর আকীদা:

(১) ওয়াহদাতুল উজুদ (Unity of God)**:** মুসলিমদের আল্লাহ্ আরশের উপর সমাসিন। স্রষ্টা (খালিক) ও সৃষ্টি (মাখলুখ) দুই সত্বা। সূফিদের আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান এবং সবকিছুতেই বিরাজমান, স্রষ্টা (খালিক) ও সৃষ্টি (মাখলুখ) একই সত্বা ইহাই ওয়াহদাতুল উজুদ। **(২) ফানা-ফি-আল্লাহ:** সূফীদের সাথে বিভ্রান্তির দ্বিতীয় বিষয় মৃত্যুর পর কবরের জীবন নিয়ে। সূফী মতবাদে মানুষ মারা গেলে সে ফানা-ফি-আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর মধ্যে মিশে যাবে। কোন জবাবদিহী আছে কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট নয়। **(৩) হুলুল আকিদাহ্ অর্থাৎ** স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যে **বিলীন হওয়া। (৪) মারেফাত অর্থ পরিচয়, সূফিদের নিকট এর অর্থ গোপন। (৫) গাওস, কুতুব, আবদাল ও নুজাবায় সূফীদের ধারনা। (৫) বুযূর্গগণ বিপদ আপদে সাহায্য ও উদ্ধার করতে পারে।** (৬) ইবাদতের সময় সূফীদের অন্তরের অবস্থা। (৭) আউলীয়ার ব্যাপারে সূফীদের ধারনা। **(৮) নবী-রাসূল এর ব্যাপারে সূফীদের বাড়াবাড়ি। (৯) ফেরাউন ও ইবলীসের ক্ষেত্রে সূফীদের বিশ্বাস। (১০) কবর বা মাজার সম্পর্কে সূফীদের ধারনা। (১১) মৃত আউলীয়ার নামে মান্নত করার ব্যাপারে সূফীদের ধারনা। (১২) আউলীয়াদের উসীলার ব্যাপারে সূফীদের ধারনা। (১৩) ইসলামের রুকন পালনের ক্ষেত্রে সূফীদের ধারনা। (১৪) সূফীদের যিকির ও অযীফা (১৫) সূফীদের চুলে ও দারিতে ঝট বাঁধা। (১৬) সূফীদের আউলীয়ার নামে শপথ। (১৭) সূফীদের হালাল-হারাম। (১৮) সূফীদের মতে জ্বিন-ইনসান সৃষ্টির উদ্দেশ্য। (১৯) সূফীরা জান্নাতের আশা ও জাহান্নামের ভয় করে না। (২০) সূফীদের গান বাজনার সাথে যিকির। (২১) সূফীদের যাহেরী ও বাতেনী ধর্ম। (২২) সূফীদের শেখ ও পীরের আনুগত্য। (২৩) পীরের আত্মার সাথে মুরিদের আত্মার সম্পর্ক তৈরী করা। (২৪) ইলমে লাদুন্নী নামে কল্পিত এক বিশ্বাস। (২৫) কারামতে আউলিয়ার ক্ষেত্রে সূফীদের বাড়াবাড়ি। (২৬) মৃতকে জীবিত করা। (২৭) সূফীদের ভ্রান্ত ওলী এবং প্রকৃত ওলী কে? (২৮) সূফীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং ওলীদের কাশ্‌ফ। (২৯) সূফীদের গায়েব সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাস। (৩০) সূফীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস, তাদের ওলীদের ইলহাম হয়। (৩১) সূফীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস, তাদের ওলীদের ফিরাসাত। (৩২) সূফীদের ভ্রান্ত দাবী তাদের ওলীদের**

হাওয়াতেফ। (৩৩) সূফীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস তাদের ওলীদের মিরাজ। (৩৪) স্বপ্নের মাধ্যমে সূফীদের প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির দাবি। (৩৫) মৃত ব্যক্তি শুনতে পারে, যা কুরআনের বিপরীত। কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তি যতবড় বুযূর্গ, আউলিয়া হোক না কেন সে জীবিত মানুষের কথা, আবেদন নিবেদন কিছুই শুনতে পারে না। এ বিষয়ে আল্লাহর সতর্ক বাণী-১ : "আপনি তো মৃতকে শুনাতে পারেন না এবং বধিরকেও আহবান শুনাতে পারেন না, যখন পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।" (সূরা নামল ২৭:৮০) এ বিষয়ে আল্লাহর সতর্ক বাণী-২: "অতএব আপনি তো মৃতকে শুনাতে পারবেন না এবং বধিরকেও আহবান শুনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।" (সূরা রুম ৩০:৫২)। এ বিষয়ে আল্লাহর সতর্ক বাণী-৩ "সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে শ্রবন করান। আপনি কবরে যারা শায়িত তাদেরকে শুনাতে পারবেন না।" (সূরা ফাতির ৩৫:২২)। কবরবাসীর ক্ষীনতম আওয়াজও শুনতে পাওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন: "আর তাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তুমি কি তাদের থেকে কারও কোন সাড়া পাও অথবা তাদের ক্ষীনতম আওয়াজ শুনতে পাও?" (সূরা মারইয়াম ১৯:৯৮) **মৃত ব্যক্তি শুনতে পারে,** এরূপ বিশ্বাস করলে, ইমান ভঙ্গ হয়ে যায়।

মানব রচিত সূফীবাদ ও বিভিন্ন দর্শনের বই বাজারে ভর্তি, দামও কম এবং অনেক ওয়াজ নসিহতে এগুলোই প্রচার করা হয়। অথচ আল্লাহর প্রেরীত কুরআন ও সহীহ-হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলিমের জন্য ফরয ও অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং কুরআন ও সহীহ-হাদীসের বাংলা অনুবাদের কিছু বই ক্রয় করে অনুশীলন শুরু করি। সেই সাথে কুরআন ও সহীহ-হাদীস সম্পর্কে বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী আলেমদের নিকট থেকে দ্বীন ইসলাম শিক্ষা করি। সঠিক দ্বীনের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতে থাকি। সূফি না হয়ে মু'মিন-মুসলিম হলেই জান্নাতে যাওয়া যাবে ইনশাল্লহ্। (সূফীবাদ বিষয়ে বিস্তারিত জানার আমার লিখিত "কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইমান ও আকিদা" বইটি অধ্যায়ন করুন।)

সাধারণ জ্ঞান ১৪. ইবাদতের প্রতিদান নারী পুরুষে সমান সমান।

নারী পুরুষের গঠন কর্ম, কর্মক্ষমতা, রুচি ও খাদ্যাভাসে বেশ পার্থক্য থাকলেও আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতিদান নারী পুরুষে সমান সমান পাবে এটাই মালিকের বিধান। এ বিষয়ে তাঁর বানী:

(১) "যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী, এবং সে ইমানদার হবে, এরূপ লোক জান্নাতে দাখিল হবে, আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।" (সূরা নিসা ৪:১২৪)।

(২) "যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে সে কেবল তদানুরুপ প্রতিফল পাবে। আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করে সে পুরুষ হোক কিংবা নারীই হোক, সে যদি মু'মিন হয় তবে এরুপ লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেথায় তাদেরকে দেয়া হবে বেহিসাব রিজিক।" (সূরা মু'মিন ৪০:৪০)।

(৩) "যে নেক কাজ করে এবং সে মু'মিন, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী, আমি তাকে অবশ্যই দান করব এক পবিত্র শান্তিময় জীবন এবং তারা যা করত তার জন্য তাদেরকে শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার দান করব।" (সূরা নহ্ল ১৬:৯৭)।

(৪) "আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মু'মিন নর ও মু'মিন নারীকে জান্নাতের, প্রবাহিত হয় যার তলদেশে নহরসমুহ, সেথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং চিরস্থায়ী জান্নাত উত্তম বাসস্থান। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত; এটাই মহা সাফল্য।" (সূরা তওবা ৯:৭২)।

সাধারণ জ্ঞান ১৫. মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য, নারী পুরুষ সবার জন্য।

আল্লাহ্ প্রথম সৃষ্টি করেছেন আদম (আ:)-কে। তার মাধ্যমে সমস্ত মানুষ সৃষ্টি করে মানব জাতীর মধ্যে আত্মীয়তা, বন্ধুত্য ভালবাসা পরস্পর সেতু বন্ধন দ্বারা শান্তিতে বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্যের বিষয়ে অনেক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন: "আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছি (তাদের সাথে সদাচরন করতে)। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারন করেছে এবং দু'বছরে তার দুধ ছাড়ানো হয়। সুতরাং শোকরগুজারী কর আমার এবং তোমার মাতা-পিতার। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। আর যদি তোমার মাতা-পিতা তোমার উপর চাপ দেয় যে, তুমি আমার সাথে এমন কিছু শরিক সাব্যস্ত কর যে সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে। আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুসরন করবে। অবসেশে আমারই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে এবং আমি তোমাদের অবহিত করব যা তোমরা করতে।" (সূরা লুকমান ৩১:১৪-১৫)।

"আমি মানুষকে স্বীয় মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছি; তবে তারা যদি তোমার উপর চাপ দেয়, আমার সাথে এমন কিছু শরিক করতে যার সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নেই, এক্ষেত্রে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যা তোমরা করতে।" (সূরা আনকাবুত ২৯:৮)।

"আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তার মা তাকে গর্ভে ধারন করেছে বড় কষ্টের সাথে এবং তাকে প্রসব করেছে অতি কষ্টের

সাথে। তাকে গর্ভে ধারন করতে ও প্রসবান্তে দুধ ছারতে ত্রিশ মাস লেগেছে। এমনকি যখন সে স্বীয় যৌবনে উপনিত হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে তখন সে বলে: হে আমার রব! আপনি আমাকে তওফিক দিন, যেন আমি আপনার সে নেয়ামতের শোকরগোজারী করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে দান করেছেন এবং যেন আমি এমন নেক কাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন। আর আমার জন্য সন্তান-সন্ততিদের মধ্যেও যোগ্যদাতা দান করুন। আমি আপনারই দরবারে তওবা করছি এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আহ্কাফ ৪৬:১৫)।

"আর তোমার রব আদেশ করেছেনে যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কর না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উসনীত হয়, তবে তুমি তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে বিনম্রভাবে সন্মানসুচক কথা বল। এবং তাদের সামনে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে অবনত অবনত থেক, আর দু'আ কর: হে আমাদের 'রব'! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবে পালন করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:২৩-২৪)।

মাতা-পিতার জন্য উত্তম কুরআনের দু'আ- رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
আরবি উচ্চারন- রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা-ইয়ানী সো'গীরা।"

মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার।

"মাহম্মদ বিন মায়মুন আল-মাক্কী থেকে সুফইয়ান বিন উইয়ায়না থেকে উমারাহ্ ইবনুল কা'কা থেকে আবু যুর'আহ্ থেকে আবু হুরায়রা (রাদি.) বর্নিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কার সাথে সদাচার করব ? তিনি বলেন: তোমার মায়ের সাথে। (১ম) তারা বললেন, অত:পর কার সাথে ? তিনি বলেন: তোমার মায়ের সাথে। (২য়) তারা বললেন, অত:পর কার সাথে ? তিনি বলেন: তোমার মায়ের সাথে। (৩য়) অত:পর কার সাথে ? তিনি বলেন: তোমার পিতার সাথে। (৪র্থ) অত:পর কার সাথে? তিনি বলেন: অত:পর পর্যায়ক্রমে নিকটবর্তীদের সাথে।" (সুনান ইবনু মাজাহ্ ৩৬৫৮, সহীহ্ বুখারী তা.পা. ৫৯৭১, আ:প্র ৫৫৩৮, ই.ফা. ৫৪৩৩, মুসলিম ৪৬২১, আহমাদ ৮১৪৪,৮৮৩৮,৮৯৬৫ . . . . .)।

সাধারণ জ্ঞান ১৬. সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার কর্তব্য।

সন্তানকে প্রথম ও বিষেশ শিক্ষার বিষয়ে আল্লাহ্র বানী: "স্মরণ কর, যখণ লুকমান (আ:) নিজের পুত্রকে উপদেশ প্রদানস্বরুপ বললেন: হে বৎস! আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরিক কর না। নিশ্চয় শিরিক তো মহা পাপ (কবিরা গুনাহ্)।" (সূরা লুকমান ৩১:১৩)।

তিনি আরও বলেন: "হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার বীজের পরিমানও হয় এবং তা যদি থাকে পাথরের ভেতরে অথবা আসমানে কিংবা ভূগর্তে, তথাপি তাও আল্লাহ্ হাজির করবনে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে খবর রাখেন। হে বৎস! সালাত কায়েম কর, ভাল কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ এবং তোমার উপর যে বিপদ-আপদ আসবে তাতে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় এ হল দৃঢ় সংকল্পের কাজ। আর তুমি অহংকারবশে মানুষকে অবজ্ঞা কর না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে বিচরন কর না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন দাম্বিক, গর্বকারীকে ভালবাসেন না। আর তুমি তোমার চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে এবং তোমার কণ্ঠসস্বর নিচূ রাখবে। নি:সন্দেহে স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বপেক্ষা অধিন অপছন্ধনীয়।" (সূরা লুকমান ৩১:১৬-১৯)।

সন্তানের প্রতি কর্তব্য পালন করতে গিয়ে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন: "ওহে যারা ইমান এনেছ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কোউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের ব্যাপারে সর্তক থাক। আর যদি তোমরা তাদেকে মার্রজনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাতেরকে ক্ষমা কর, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরুপ। আর আল্লাহ্রই কাছে রয়েছে মহা পুরুস্কার।" (সূরা তাগাবুন ৬৪:১৪-১৫)। সন্তান-সন্ততি ও ধন সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্ পরীক্ষা করবেন এবিষয়ে আল্লাহ্ বলেন: "অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করা হবে তোমাদের ধন-সম্মদ এবং জন-সম্পদে। . . . . ." (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৮৬)। নাবালোক ও কম বুদ্ধিমানদের হতে সম্পদ হস্তান্তন করতে নিশেধ করে আল্লাহ্ বলেন: "আর তুলে দিওনা নির্বোধদের হাতে তোমাদের ঐ সম্পদ যা আল্লাহ্ তোমাদের জীবন নির্বাহের অবলম্বন করেছেন। বরং তা থেকে তাদের খাওয়াও, পরাও এবং শুনাও তাদের সান্তনার বানী।" (সূরা নিসা ৪:৫)। রিযিকের ভয়ে সন্তানকে হত্যা করতে নিশেধ করে আল্লাহ্ বলেন: "আর তোমরা নিজেদের সন্তানকে হত্যা কর না। আমি রিযিকি দেই তাদেরকেও এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহা পাপ।" (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৩১)। শুধু সন্তান-সন্ততির দোহাই দিয়ে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত না থাকতে আল্লাহ্ বলেন: "ওহে যারা ইমান এনেছ! তোমাদের ধন-সম্মদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তামাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল না করে, আর যারা এরুপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ লোক।" (সূরা মুনাফিকুন ৬৩:৯)। সন্তানকে দুধ পান করান মহিলাদের নৈতিক দায়িত্ব ও আল্লাহ্র বিধান: "মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে . . . ." (সূরা আল-বাকারা ২:২৩৩)। পৃথিবীর জল-স্থলের সকল প্রাণী তাদের সন্তানদের দুধ পান করায়। একমাত্র মানুষকে পরিক্ষা করার জন্য স্বাধিনতা রয়েছে এবং কতদিন দুধ পান করাবে তারও সময়সীমা বর্নিত আছে। আল্লাহ্

বলেন: "আর আমি তার মাতা-পিতাকে নির্দেশ দিয়েছি (তাদের সাথে সদাছরণ করতে)। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধাণে করেছে এবং দু'বছরে তার দুধ ছাড়ানো হয়। সুতরাং শোকর কর আমার ও তোমার মাতা-পিতার। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।" (সূরা লুকমান ৩১:১৪।

অনেক সময় মেয়ে সান্তান জন্ম দেয়ার জন্য মহিলাদেরকে তিরষ্কার করা হয়। অথচ এটা কোন মহিলাদের হাতে নেই। এ বিসয়ে আল্লাহ্ কুরআনে বলেন: "নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।"

(সূরা শুরা ৪২: ৪৯-৫০)।

সাধারণ জ্ঞান ১৭. আরবি দিন, চন্দ্র মাস, হিজরি সাল গণনা পদ্ধতি। (বর্তমান ১৪২৬ বঙ্গাব্দ ও ১৪৪১ হিজরি, ২০১৯খৃ:)।

সময় অতী মূল্যবান! দিন, রাত, মাস ও বছর নির্ধারণ এবং এর গণনার জন্য উপায় উপকরণ আল্লাহ্ শুরু থেকেই সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়:

(১) "তিনি এমন সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্যকে প্রচণ্ড দিপ্তিময় ও চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলোকময় এবং নির্ধারণ করেছেন এর জন্য মনযিল (হ্রাস বৃদ্ধি, আমাবশ্যা ও পুর্নিমা) যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা ও হিসাব। আল্লাহ্ এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি আয়াতসমূহ্ বিশদভাবে বর্ণনা করেন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।" (সূরা ইউনুস ১০:৫)।

(২) "যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা একই নিয়মে অনবরত চলছে এবং তোমাদের হিতার্থে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে।" (সূরা ইবরাহিম ১৪:৩৩)।

(৩) "সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত আবর্তন করে।" (সূরা আর-রহমান ৫৫:৫)।

(৪) "তিনিই ভোরের উন্মেষ ঘটান, তিনিই সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য রাত এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র। এ সবই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নির্ধারণ।" (সূরা আন'আম ৬:৯৬)।

(৫) "আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।" (সূরা আম্বিয়া ২১:৩৩)।

আরবদের দিনের গননা শুরু হয়, প্রথম সূর্য অস্ত থেকে প্রথম পূর্ণ রাত এবং পরবর্তি পূর্ণ দিন শেষে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময় ১ দিন বা ২৪ ঘন্টা ধরা হয়। ফলে দিন

তারিখ হিসাবের জন্য কোন যন্ত্র-পাতি, ঘড়ি বা পঞ্জিকার প্রয়োজন হয় না। এভাবে আরবগণ পূর্ব থেকেই চন্দ্র মাস গণনা করতো বাস্তব ও সহজ পদ্ধতিতে। এক চাঁদ উদয় থেকে অপর চাঁদ উদয় পর্যন্ত ১ মাস ধরা হয়। চাঁদের উদয়ের রাত থেকে পরের চাঁদের উদয় সময় কোন মাসে ২৯ দিন এবং কোন মাসে ৩০ দিন হয়ে থাকে, এটাই চিরন্তন নিয়ম। ১২ চন্দ্র মাসে ১ চন্দ্র বছর ধরা হয়, দিনের হিসাবে ৩৫৬ দিন ৬ ঘন্টা। আরবি চন্দ্র মাসের নাম- ১. মুহাররাম, ২. সফর, ৩. রবিউল আউয়াল, ৪. রবিউছ্ ছানী, ৫. জুমাদাল আউয়াল,
৬. জুমাদাছ্ ছানী, ৭. রজব, ৮. শা'বান, ৯. রমাজান, ১০. শাওয়াল, ১১. জুল কাদাহ্ ১২. জুল হাজ্।

যেদিন থেকে বিশ্ব নবী মুহাম্মদ (ﷺ) মাক্কা থেকে মাদীনায় হিজরত করেছিলেন সেদিন থেকে হিজরি সন শুরু হয়েছিল। এর এক বছর পর প্রথম ১ হিজরি ধরা হয়েছিল। হিজরি সন গণনায় মুসলিমদের ঐতিহাসিক তথ্য স্মরণ রাখা সুবিধাজনক। যেমন- ১০ হিজরিতে মুহাম্মদ (ﷺ) মারা গেছেন। ৪০ হিজরিতে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ শেষ হয়েছে। ৬১ হিজরিতে কারবালার যুদ্ধে হোসাইন (রাদি.) শহীদ হন। ১৩২ হিজরি পর্যন্ত দামাস্কের উমাইয়াদের ইসলামিক শাসনের অবসান হয়। ৬৫৬ হিজরি বাগদাদের আব্বাসীয়দের ইসলামিক শাসনের অবসান হয়। এর পর চেঙ্গিস খানের নাতি হালাকু খানের বগাদাদ দখল এবং গণ-হত্যার ইতিহাস . . . .। আমরা যে কোন বই বা ইসলামি তথ্য যাচাই করতে চাইলে হিজরি সনের হিসাবই সঠিক হবে। যেমন- ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) সময়কাল (৮০-১৫০) হিজরি। আপনার জন্ম তারিখ হিসাব করে হিজরি সন লিখে রাখুন . . .। ডাইরিতে বন্ধুদের ও সন্তানদের জন্ম তারিখ বাংলা ও ইংরেজির পাশে হিজরি সন লিখে রাখুন। হিজরি সন আমাদের ইসলামি জীবনে সময়ের আইকন ও ঐতিয্য। মুসলিমদের যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান চন্দ্র মাসকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। যার জন্য কোন যন্ত্র পাতির, ঘড়ি বা পঞ্জিকার প্রয়োজন নেই। সাধারণ মানুষ নিজের চোখে দেখে দিনের ও মাসের শুরু ও শেষ নির্ধারণ করতে পারে।

খৃষ্টীয় দিন, মাস, খৃষ্টাব্দ গণনা ও পরিচিতি। (বর্তমান ২০১৯ খৃষ্টাব্দ)

ইংরেজি কায়দায় দিন গণনা ধরা হয় এক মধ্য রাত্রী থেকে অপর মধ্য রাত্রী পর্যন্ত। এখন মধ্য রাত্রী পরিমাপ করা যাবে কিভাবে ? ঘড়ি না থাকলে আন্দাজে বা তারকার অবস্থান দেখা ছাড়া গতি নেই। ইংরেজি বছরে, মাস নির্ধারণে মানব রচিত পঞ্জিকা পদ্ধতিতে ২৮/২৯/৩০/৩১ দিন ধরা হয়, যা খুবই জটিল। ১২ সৌর মাসে, ১ সৌর বছর ধরা হয়, দিনের হিসাবে ৩৬৫ দিন ৪ ঘন্টা। খৃষ্টানগণ তাদের বর্ষ গণনা শুরু

করেছিল ইসা (আ:)-এর জন্মের বছর থেকে। যাকে বলা হয় খৃষ্টাব্দ, আরব দেশে মিলাদ ইসায়ী সন ইত্তাদি।

১৮. মহিলাদের পবিত্রতা অর্জন বিষয়ের শিক্ষা।

ইসলামের ৫টি রুকন, ইমানের ৬টি রুকন এবং ইহসানের ১টি রুকন জানলে এবং মানলে সে পূর্ণ মুসলিম বলে গণ্য হবে। এরপর ইবাদতের জন্য প্রথম কাজ পবিত্রতা অর্জন। ওজু, গোসল ও তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে স্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন: "ওহে যারা **ইমান** এনেছ! তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতে চাও, তখন তোমরা ধৌত করে নেবে নিজেদের মুখমণ্ডল এবং হাত কনুই পর্যন্ত আর মাসাহ করে নিবে নিজেদের মাথা এবং ধৌত করে নেবে নিজেদের পা গ্রন্থি (টাখনু) পর্যন্ত। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে (গোসল করে) পবিত্র হবে। আর যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসো কিংবা তোমরা স্ত্রী সহবাস করো, তারপর পানি না পাও তবে তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে। ঐ মাটি দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের অসুবিধায় ফেলতে চান না। বরং, তিনি তোমাদের পাক-পবিত্র রাখতে চান। তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করতে চান। যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সূরা আল-মায়িদা ৫:৬)।

তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "হে যারা **ইমান** এনেছ! তোমরা নেশায় মত্ত অবস্থায় নামাজের কাছেও যেয়ো না যতক্ষন না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার; আর অপবিত্র অবস্থায় নয় যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর, তবে মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাক অথবা তোমরা স্ত্রী সহবাস করে থাক এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর নাও। মাসাহ করবে স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাত। নিশ্চয় আল্লাহ হলেন অতিশয় মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।" (সূরা আন-নিসা ৪:৪৩)।

১৯. পানি দ্বারা ওযুর পূর্বে মিসওয়াক করার ফাযীলাত।

ওযুর পূর্বে মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করার ফাযীলাত অনেক। "হুমায়দ ইব্ন মাসআদাহ্ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (রহ.) . . . . . আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, মিসওয়াক (দাঁত পরিষ্কার)

মুখের পবিত্রা অর্জনের উপকরণ ও আল্লাহ্‌র সন্তোস লাভের উপায়। (সনানু নাসাঈ শরীফ ই.ফা. অধ্যায়: পবিত্রতা,হাদিস-৫)।

ফিকাহ-

মুখের দর্গন্ধ দাঁত থেকে বা পাকস্থলি থোকে হতে পারে। তবে বাহ্যিকভাবে দাঁত পরিষ্কার করাকেই গুরুত্ব দেয় হয়েছে যার অনেক সুফল রয়েছে।

২০. পানি দ্বারা ওযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন। রাসুলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর ওযুর একটি নমুনা হাদিস উল্লেখ করা হল। "উসমান বিন আফ্‌ফান (রাদি.)-এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান ইবনে আবান থেকে বর্নিত। একদা "উসমান বিন আফ্‌ফান (রাদি.) ওযুর জন্য এক পাত্র পানি আনিয়ে তা দিয়ে ওযু করলেন। প্রথমে তিনি দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ৩ বার ধুলেন। অত:পর কুলি করলেন এবং নাকি পানি দিলেন। এরপর ৩ বার মুখমন্ডল এবং ৩ বার ডান হাতের কনুই পর্য়ন্ত ধুলেন। পরে অনুরুপভাবে বাম হাতও ধুলেন। তারপর মাথা মাস্‌হ্ করলেন। এরপর ৩ বার পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধুলেন। অত:পর তিনি বললেন: আমি এখন যেভাবে ওযু করলাম রাসুলুল্লাহ্ (ﷺ)-কেও অনুরুপ ওযু করতে দেখেছি। ওযু শেষে রাসুলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার এই ওযুরমত ওযু করার পর দাঁরিয়ে একাগ্র চিত্তে দু'রাকাত সালাত পড়বে, আর এ সময় তার অন্তরে কোন চিন্তা উদয় হবে না, তাহলে তার পূর্বকৃত সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। ইবনে শিহাব বলেছেনে, আমাদের আলেমগণ বলতেন, সালাতের জন্যএরুপ ওযুই পরিপূর্ণ ওযু।" (সহীহ্ মুসলিম ই.সে. হাদিস-৪৪৫)।

২১. ফরজ গোসলের পূর্বে ওযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন।

"আয়িশা (রাদি.) হতে বর্ণিত যে, নবী (ﷺ) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে তাঁর হাত দু'টো ধুয়ে নিতেন। অত:পর সালাতের অজুর মতো অজু করতেন। অত:পর তাঁর আঙ্গুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। অত:পর তাঁর উভয় হাতের তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢালতেন। তারপর তাঁর সারা দেহের উপর পানি ঢেলে দিতেন।" (সহীহ বুখারী তা. প্র. ২৪৮, ই.ফা. ২৪৬)।

২২. ফরজ গোসলে পবিত্রতা অর্জনে কুলি ও নাকে পানি দেওয়া।

মহিলাগণের হায়েয শেষে, নিফাসের শেষে, স্বপ্নদোষ এবং সহবাসের কারণে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল ফরয। কীভাবে গোসল করতে হবে সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গোসলের একটি নমুনা হাদিস থেকে উল্লেখ করা হল।

"ইবনু আব্বাস (রাদি.) হতে বর্ণনা করেন যে, মায়মূনাহ (রাদি.) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য গোসলের পানি ঢেলে রাখলাম। তিনি তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত ধুইলেন। অতঃপর তাঁর লজ্জাস্থান ধৌত করলেন এবং মাটিতে তাঁর হাত ঘষলেন। পড়ে তা ধুয়ে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, তারপর তাঁর চেহারা ধুইলেন এবং মাথার উপর পানি ঢাললেন। পরে ঐস্থান হতে সরে গিয়ে দুই পা ধুইলেন। অবশেষে তাঁকে একটি রুমাল দেয়া হল, কিন্তু তিনি তা দিয়ে শরীর মুছলেন না।" (সহীহুল বুখারী তা.পা. হাদিস নং ২৫৯; ই.ফা. ২৫৭)।

২৩. ফরজ গোসলে পবিত্রতা অর্জনে অঙ্গসমূহ পৃথকভাবে ধোয়া।

অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য কীভাবে ফরয গোসল করতে হবে সে বিষয়ে নবী কারীম (ﷺ)-এর গোসলের একটি নমুনা হাদিস থেকে উল্লেখ করা হল।

“মায়মূনাহ (রাদি.) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম, তিনি উভয় হাতে পানি ঢেলে দু'বার করে বা তিনবার করে তা ধুয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে ঢাললেন এবং তাঁর লজ্জাস্থান ধুয়ে নিলেন। পরে তাঁর হাত মাটিতে ঘষলেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। আর তাঁর চেহারা ও হাত দু'টো ধুইলেন। তারপর তাঁর মাথা তিনবার ধুইলেন এবং তাঁর সারা শরীরে পানি ঢাললেন। অবশেষে সেখান হতে একটু সরে গিয়ে দু'পা ধুয়ে ফেললেন।” (সহীহুল বুখারী তা.পা. ২৬৫; ই.ফা. ২৬৩)।

২৪. পানির পরিবর্তে মাটি দ্বারা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন।

পানি দুষ্পাপ্য হলে পানির পরিবর্তে মাটি দ্বারা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন। “. . . . আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাক অথবা তোমরা স্ত্রী সহবাস করে থাক এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও। মাসাহ করবে স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাত। নিশ্চয় আল্লাহ হলেন অতিশয় মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।” (সূরা আন-নিসা ৪:৪৩)।

এ বিষয়ে অনেক হাদিস থেকে একটি “আব্দুর রহমান (রাদি.) হতে বর্নিত। তিনি বলেন: আম্মার (রাদি.) উমর (রাদি.)-কে বলেছিলেন: আমি (তায়াম্মুমের জন্য)

মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরে নবী (ﷺ)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি বলেছিলেন: মুখমন্ডল ও হাত দু'টো মাস্হ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট।" (সহীহুল বুখারী তা.পা. ৩৪১; আ:প্র.৩২৯; ই.ফা. ৩৩৪)।

২৫. মৃত মহিলার লাশের গোসল মহিলার দ্বারা সম্পন্য কয়া।

মুসলিম নর নারী মারা যাওয়ার পর তাদের গোসল, কাফন, জানাযা এবং দাফন কাজগুলো বেশ দ্রুত করতে হয়। মৃত মহিলাদের লাশ কীভাবে গোসল করাতে হয় সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গোসলের একটি নমুনা হাদিস থেকে উল্লেখ করা হল। "উম্মু আতিয়্যা (রাদি.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এক কন্যার (যাইনাব) মৃত্যু হল। তিনি বললেন: তোমরা বেজোড় সংখ্যায় তিন বার বা পাঁচ বার অথবা প্রয়োজনে এর চেয়েও অধিক বার তাঁকে গোসল দিতে পার। বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও। আর শেষবার পানিতে কর্পূর বা কিছু পরিমাণ কর্পূর ঢেলে দাও। তোমাদের গোসল করানো শেষ হয়ে গেলে আমাকে জানিয়ে দিও। অতএব, তার গোসল শেষ করে আমরা তাঁকে জানালাম। তিনি তাঁর লুঙ্গি আমাদের দিকে ছুড়ে দিলেন এবং বললেন: তাঁর শরীরে এটিকে জড়িয়ে দাও। হুসাইম বলেন: এদের (খালিদ, মনসূর) ব্যতীত অন্যদের, হয়ত হুশাইমও তাদের একজন, বর্ণনায় আছে যে, উম্মু আতিয়্যা (রাদি.) বলেন, আমরা তাঁর চুলকে তিন ভাগে বিন্যস্ত করলাম। হুসাইম বলেন, আমার ধারণায় তিনি এও বলেছেন: তাঁর চুলগুলোকে আমরা তাঁর পিছন দিকে ছেড়ে দিলাম। হুসাইম বলেন: এদের মধ্যে খালিদ আমাকে হাফসা ও মুহাম্মদ, উম্মু আতিয়্যা (রাদি.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে বললেন: তাঁর ডান পাশ দিয়ে তাঁর ওযুর স্থানসমূহ হতে গোসল শুরু কর।" (আত-তিরমিযি হাদিস নং ৯৯০)।

মহিলাদের মৃত লাশের গোসলের বিষয়ে ইমামদের ব্যাখ্যা:

উম্মু সূলাইম (রাদি.) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। উম্মু আতিয়্যা (রাদি.) হতে বর্ণিত হাদিসটিকে আবু ঈসা (ইমাম তিরমিযি) হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদিস অনুযায়ী আলেমগণ আমল করেছেন।

ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) বলেন: নাপাক ব্যক্তির গোসলের নিয়মের মতই মৃতের গোসল করানোর নিয়ম।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন: আমাদের মতে মৃত ব্যক্তির গোসল করানোর ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই। আসল কাজ হচ্ছে তাকে পাক সাফ করা।

ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন: মালিক (রহ.) একটি অস্পষ্ট কথা বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তিকে পরিষ্কার পানি বাঁ অন্য কোন পানি দ্বারা গোসল করিয়ে তাঁর দেহ হতে ময়লা দূর করে দিলেই যথেষ্ট। আমার মতে মৃত ব্যক্তিকে তিন বা ততোধিক বার বেজোড় সংখ্যায় গোসল করানো মুস্তাহাব। তবে যেন তিন হতে কম না হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন তিনবার অথবা পাঁচবার গোসল করাও। যদি তিনবারের কমেই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং তাই যথেষ্ট হয়, তবে তাঁর এই বক্তব্য তিন বা পাঁচবার এর কোন অর্থ হয় না। এই বিষয়ে তিনি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারিত করে দেন নি একথা বলা যায় না। ফকীহগণও এ রকম কথা বলেছেন। হাদীসের প্রকৃত মর্ম তারাই হৃদয়াঙ্গম করতে পারেন।

ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (রহ.) বলেন: বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাতে হবে এবং শেষবারে কর্পূর মিশ্রিত পানি দিতে হবে।

২৬. মহিলাদের 'হায়েয' মাসিক রক্তস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন।

মহিলাদের মাসিক রক্তস্রাব বা ঋতু বিষয়ে আল্লাহ্ কুরআনে বলেন: "তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে রক্তস্রাব সম্বন্ধে। আপনি বলুন: তা অরুচিকর। কাজেই রক্তস্রাব অবস্থায় তোমরা স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না। সুতরাং যখন তারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তোমরা তাদের কাছে ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাওবাহকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালবাসেন।" (সূরা বাকারা ২: ২২২)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা বা ফিকাহ:

(১) সাবালিকা হওয়ার পর প্রত্যেক নারীর লজ্জাস্থান থেকে মাসে একবার যে রক্ত আসে, তাকে হায়েয, মাসিক বা ঋতুস্রাব বলা হয়। আবার কখনো কখনো কোন রোগের কারনে বা নিয়মের অতিরিক্তও রক্ত-ক্ষরন হলে; তাকে ইস্তিহাযা বলে। ইস্তিহাযার বিধান হায়েযের থেকে ভিন্ন। মাসিকের দিনগুলোতে সালাত মাফ এবং সিয়াম পালন করা নিষেধ। তবে সুস্থ হলে সিয়ামের কাযা করতে হবে। এই সময় পুরুষের জন্য কেবল সঙ্গম করা নিষেধ। তবে চুম্বন ও আলিঙ্গন করা জায়েয। অনুরূপ মহিলাগণ হায়েযের দিনগুলোতে রান্না সহ সংসারের অন্য সব কাজই করতে পারে।

স্ত্রীগমন বা নিকটবর্তী না হওয়ার বা দূরে থাকার অর্থ কেবল সঙ্গম করা নিষেধ। (তফসীর ইবনে কাসীর)।

(২) 'যখন তারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে' এর দু'টি অর্থ বলা হয়েছে।
(ক) যখন রক্ত আসা বন্ধ হয় তখন গোসল ছাড়াই সে পবিত্র হয়।
এ অবস্থায় পুরুষের জন্য তার সাথে (গোসলের পূর্বে) সহবাস করা জায়েয। ইব্নে হায্ম, আলবানীসহ কিছু ইমাম এরই সমর্থন করেছেন। (আদাবুয্ যিফাত, পৃষ্ঠা- ৪৭)।

(খ) 'যখন রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করে সে পবিত্র হয়। রক্ত বন্ধ হলেও গোসলের পূর্বে সহবাস করা জায়েয নয়। ইমাম শাওকানী এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (ফাতহুল কাদীর)।

মহিলাদের 'হায়েয' মাসিক রক্তস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের পর।
'তখন তোমরা তাদের কাছে ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন' অর্থাৎ মাসিক অবস্থায় সঙ্গমের জন্য যোনীপথই ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং মাসিক বন্ধ হলে পুনরায় সঙ্গমের জন্য যোনীপথই ব্যবহার করতে হবে অন্য পথ নয়। হাদিসে পরিস্কারভাবে উল্লেখ আছে স্ত্রী ও পুরুষের মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম। অত্যান্ত নোংরা এবং গোনাহর কাজ।

২৭. স্ত্রী-পুরুষের কিছু ফিত্বরাত বা স্বভাবসুলভ কাজ আছে।

"আয়িশাহ্ (রাদি.) সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: ১০টি কাজ মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবসুলভ: (১) গোঁফ কাটা, (২) দাড়ি ছেড়ে দেয়া, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬) আঙ্গুলের জোড়া সমুহ ধোয়া, (৭) বগলের পশম তুলে ফেলা, (৮) নাভির নিচের পশম চেঁছে ফেলা, (৯) পানি দিয়ে সৌচ বা ইস্তিন্জা করা, (১০) মুস'আব বলেন, দশম কাজটি আমি ভুলে গেছি। সম্ভবত: সেটি হলো-কুলি করা।"(সুনান আবু দাউদ অধ্যায়-১,পবিত্রতা অর্জন,অনুচ্ছেদ-২৯, হা.৫৩, আত-তিরমিযী হা.২৭৫৭, হবনু মাজাহ্ হাদিস-২৯৩)।

২৮. স্ত্রী-পুরুষের কিছু ফিত্বরাত কাজের মেয়াদ নির্ধরন।

"কুতায়বা (রাদি.) . . . আনাস ইব্ন মালিক (রাদি.) সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের জন্য গোঁফ কাটা, নখ কাটা, নাভির নিচের পশম চেঁছে ফেলা ও বগলের পশম তুলে ফেলার মোদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমরা যেন এ

কাজগুলি চল্লিশ দিনের বেশি সময় পর্য়ন্ত ফেলে না রাখি। রাবী বলেন আরেকবার চল্লিশ রাতের কথাও বলেছেন।" (সনানু নাসাঈ শরীফ ই.ফা. অধ্যায়: পবিত্রতা, হাদিস-১৪)।

২৯. স্ত্রীর নির্ধারিত পথ ছাড়া ভিন্ন পথে সঙ্গম করা নিশেধ।

"মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিক বিন শাওয়ারিব হতে আব্দল আযীয ইবনুল মুখতার হতে সুহায়ল বিন আবু সালেহ হতে হারিস বিন মুখাল্লিদ হতে আবু হুরায়রা (রাদি.) হতে বর্নিত, নবী (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করে, আল্লাহ্ তার দিকে (দয়ার-দৃষ্টিতে) তাকান না।" (তাহকীক সুনান ইবনু মাজাহ্ ১৯২৩, আবু দাউদ ২১৬২, আহমাদ ৭৬২৭, দারিমী ১১৪০, বায়হাকী ৭/৩৭৪।)

"আহমাদ বিন আবদাহ হতে অবাদু ওয়াহিদ বিন যিয়াদ হতে হাজ্জাজ বিন আরতাহ্ হতে আমর বিন শুআয়ব হতে আব্দুল্লাহ বিন হারমী হতে খুজায়মাহ বিন সাবিত (রাদি.) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, রসুল র. বলেছেন: আল্লাহ্ সত্য বলতে লজ্জা বোধ করেন না। কথাটি তিনি তিন বার বলেন। (অত:পর বলেন) তোমরা মহিলাদের মলদ্বারে সঙ্গম করো না।" (তাহকীক সুনান ইবনু মাজাহ্ ১৯২৪, আবু দাউদ ২১৬২, আহমাদ ২১৩৪৩, দারিমী ১১৪৪, ইরওয়া ২০০৫, মিসকাত ৩১৯২।)।

৩০. হায়েয অবস্থায় সালাত, সিয়াম ও সঙ্গম হতে বিরত থাকা।

"আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাদি.) হতে বর্ণিত। একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈদের সালাতের মাঠের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: হে মহিলা সমাজ! তোমরা সাদাকাহ করতে থাক। কারণ আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক। তারা (মহিলাগণ) জিজ্ঞেস করলেন: কী কারণে, হে আল্লাহর রাসূল ? তিনি বললেন: তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাক, আর স্বামীর অকৃজ্ঞ হও। বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে, তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখি নি। তারা (মহিলাগণ) বললেন: আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায়, হে আল্লাহর রাসূল ? তিনি বললেন: একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয় ? মহিলাগণ উত্তর দিলেন হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়েয অবস্থায় তারা কী সালাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না ? মহিলাগণ উত্তর দিলেন হ্যাঁ। তিনি বললেন: এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের ত্রুটি।" (সহীহুল বুখারী, তা. পা. ৩০৪; ই. ফা. ২৯৮)।

৩১. হায়েয অবস্থায় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ হতে বিরত থাকা।

ইসলামের ৫টি রুকনের মধ্যে হজ্ব হচ্ছে পঞ্চম রুকন। হজ্ব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এর সাথে স্ত্রী ও পুরুষের আলাদা অনেক শর্ত আছে। হজ্বের সফরে সালাত ছাড়া কাবা ঘরের তাওয়াফ ও অনন্যা কর্মে শারীরিক শক্তি ও পবিত্রতা প্রয়োজন। হজ্ব ব্রতে মহিলাদের মাসিক রক্তস্রাব একটি বাড়তি সমস্যা।

এবিষয়ে হাদিস: "আয়েশা (রাদি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হায়েযগ্রস্তা হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া হজ্বের বাকী সব অনুষ্ঠান পালন করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন।" (সহীহ আত-তিরমিযি, হাদিস নং নং ৯৪৫; ইবনু মাযা ২৯৬৩)।

৩২. মহিলাদের 'নিফাস' সন্তান প্রসবের পর পবিত্রতা অর্জন।

মহিলাদের সন্তান প্রসবের পর বেশ কিছু দিন মাসিক রক্তস্রাবের ন্যায় রক্তস্রাব হয় যাকে নিফাস বলে। ঐ সময় থেকে 'নিফাস' (স্রাবের রক্ত) বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সহবাস বন্ধ থাকবে। সালাত এবং সিয়ামও বন্ধ থাকবে। নিচের হাদিস থেকে দেখা যায় নিফাসকে হায়য এবং হায়যকে নিফাস উল্লেখ করা হয়েছে। "উম্মু সালামা (রাদি.) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন: আমি নবী (ﷺ)-এর সঙ্গে একই চাদরের নীচে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার হায়েয দেখা দিলে আমি চুপি চুপি বেড়িয়ে গিয়ে হায়েযের কাপড় পরে নিলাম। তিনি বললেন: তোমার কি নিফাস দেখা দিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর সঙ্গে চাদরের ভেতর শুয়ে পড়লাম।" (মুসলিম ই. সে. ৫৯০)।

সুতরাং নিফাস শেষে অর্থাৎ রক্ত বন্ধ হওয়ার পর স্বাভাবিক ওজু গোসল করে সালাত, সিয়াম, তেলাওয়াত, স্বামীর সাথেও মেলামেশাসহ যাবতীয় ইবাদত করতে পারবে।

৩৩. মহিলাদের জানাবাত (সহবাস) থেকে পবিত্রতা অর্জন।

পুরুষের ন্যায় মহিলাদেরও জানাবাত (সহবাস) থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করা ফরজ। কীভাবে গোসল করতে হবে সে বিষয়ে নবী করীম (ﷺ)-এর গোসলের একটি নমুনা হাদিস থেকে উল্লেখ করা হল।

"মাইমূনাহ (রাদি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: 'আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর উযুর ন্যায় উযূ করলেন, পা দুটো ব্যতীত এবং তার লজ্জাস্থান ও যে যে স্থানে নাপাকী লেগেছে তা ধুয়ে নিলেন। অতঃপর নিজের উপর পানি ঢেলে দেন। অতঃপর সেখান

হতে সরে গিয়ে পা দু'টো ধুয়ে নেন। এই ছিল তাঁর জানাবাতের গোসল।" (সহীহুল বুখারী তা. প্র. হাদিস নং ২৪৯; ই. ফা ২৪৭)।

৩৪. মহিলাদের স্বপ্নদোষ থেকে পবিত্রতার অর্জন।

পুরুষের ন্যায় মহিলাদেরও ঘুমের ভীতর স্বপ্নদোষ হয়ে থাকে। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর কাপড়ে বা গুপ্তাঙ্গে কোন আলামত পাওয়া গেলে গোসল করা ফরজ।

এ বিষয়ে হাদিস:

"আয়িশা (রাদি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আনাস ইবনু মালিকের মা উম্মু সুলাইম আল-আনসারিইয়্যাহ (রাদি.) রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ সত্যের ক্ষেত্রে লজ্জা করেন না! আচ্ছা, পুরুষের ন্যায় নারীদেরও যদি ঘুমে ঐ রূপ কিছু দেখে, তাহলে তাকে গোসল করতে হবে কিনা ? আয়িশা (রাদি.) বলেন, রাসূল (ﷺ) বললেন: হাঁ, পানি দেখতে পেলে তাকেও গোসল করতে হবে। আয়িশা (রাদি.) বলেন, আমি উম্মু সুলাইমকে বললাম, তোমার জন্য দুঃখ হচ্ছে! পুরুষের ন্যায় নারীদেরও আবার স্বপ্নদোষ হয় নাকি ? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার দিকে হেসে বললেন: হে আয়িশা! তোমার ডান হাত ধুলিমলিন হোক। যদি এরূপই না হবে, তাহলে সন্তান মায়ের আকৃতির হয় কি করে ? " (সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ২৩৭)।

হাদিস থেকে শিক্ষা ফিকাহ:

(১) মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে এবং বীর্য নির্গত হওয়ার আলামত পেলে তাদের জন্য গোসল করা ওয়াজিব। (২) পুরুষের ন্যায় নারীদেরও স্বপ্নদোষ হয়। (৩) কোন বিষয়ে শারঈ হুকুম জানা না থাকলে তা জিজ্ঞেস করা বৈধ। লজ্জা যেন এতে প্রতিবন্ধক না হয়। 'ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র.) . . . আনাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: পুরুষের বীর্য গাঢ় সাদা এবং নারীর বীর্য পাতলা হলদে বর্ণের। এতদুভয়ের যেটিই পুর্বে নির্গত হয় সন্তান তার সাদৃশ হয়ে থাকে। (সুনানু নাসাঈ, ই.ফা. ২০০)।

৩৫. যাদের সাথে মহিলাদের বিবাহ হারাম।

যাদের সাথে বিবাহ হারাম তাদেরকে মাহরাম বলা হয়। তবে তাদের সাথে সাক্ষাত করা, দেখা করা জায়েয আছে। এ বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেন: "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃ-কন্যা, ভাগিনী-কন্যা, দুধ-মাতা (মা

ছারা অন্য মহিলার স্তন্যপান করলে সে হয় দুধ-মাতা), তোমাদের দুধ-বোন, শাশুড়ী (তোমাদের স্ত্রীদের মাতা), তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা-যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা, কিন্তু যা অতীত হয়েছে, তা হয়েছে । নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা নিসা ৪: ২৩)।

৩৬. স্তনের দুধ পানের সাথে সমপৃক্ত পুরুষের সাথে বিবাহ হারাম।

"আয়েশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেল, দশবার দুধ চুষলে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়। একথা কুরআনে নাযিল হয়েছিল। পরে এ হুকুম মানসুখ হয়ে পাঁচবার দুধ চুষলে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম হয়েছিল। আর যে সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাত হয় তখন তা কুরআনের অংশ হিসেবে তিলাওয়াত করা হত।" (সহীহ মুসলিম ই.সে. ৩৪৬১)।

হাদীসের ব্যাখ্যা বা ফিকাহ:

আয়েশা (রাদি.) এর মতে, এই হাদিস থেকে প্রমানিত হয় যে, দুধপান করার কারনে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়ার জন্য বয়সের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। যে কোন বয়সে কোন মহিলার দুধ পান করলেই তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু সাহাবা, তাবেয়ীন ও বিশেষজ্ঞ আলেমদের মত হলো, দুই বছরের কম বয়সের শিশু দুধ পান করলে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে অবশ্য এই সীমা আড়াই বছর এবং ইমাম যুফা (রাহ.)-এর মতে তিন বছর। অধিকাংশ আলেম যে মত পোষন করেছেন তার সমর্থনে তারা কুরআন মাজিদের এই আয়াত পেশ করে থাকেন। "মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে, যদি দুধ পান করানোর পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। . . . ." (সূরা বাকারা, ২:২৩৩ অংশ)। "আয়েশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: একবার বা দুইবার মাত্র স্তন্য-চোষনে (বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন) হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয় না।" (সহীহ মুসলিম ই. সে. ৩৪৫৪)।

হাদীসের ব্যাখ্যা বা ফিকাহ:

অধিকাংশ উলামা এবং ইমামদের মতে, একবার মাত্র স্তন্য চোষনের দ্বারাই হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়। যারা এ মত পোষন করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আলী (রাদি.), আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাদি.), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদি.), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদি.), আতা, তাউস, ইবনুল মুসাইয়েব, হসান বসরী, মাখহুল, যুহরী, কাতাদা, হাকাম, হাম্মাদ, ইমাম মালিক, আওযায়ী, সাওরী এবং

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)। কেননা কুরআন মাজীদে শুধু 'ওয়া উম্মহাতি কুমুল্লাতি আরদানাকুম' আর তোমাদের স্তন্যদাত্রী মা তোমাদের জন্য হারাম' উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৭. মহিলাদের বিবাহে তার সুস্পষ্ট অনুমতি থাকতে হবে।

শান্তিপূর্ণ জীবন ও নিরাপত্তার জন্য বিবাহ প্রয়োজন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ কুরআনে মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন এবং সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। প্রজনন ও শিশু প্রতিপালনের জন্য বিবাহ একটি উত্তম পদ্ধতি। যুগে যুগে মানুষ আল্লাহর বিধান ভুলে নিজেরা মনগড়া কিছু অনিয়মকে নিয়ম করেছিল। মুহাম্মদ (ﷺ)-এর পূর্বে মহিলাদের কোন বিষয়ের উপর নিজস্ব স্বাধীনতা ছিল না বললেই চলে। তারা মায়েদের, স্ত্রীদের এবং কন্যাদের উপর নিজের মালিকানা ও আধিপত্য চালাত। যত্রতত্র তাদের বিবাহ দিত। এর জন্য মহিলাদের কোন অনুমতির প্রয়োজন হতো না। কিন্তু ইসলামে নারীর অধিকার দিয়ে তাদের মতামতেরও ব্যবস্থা করেছে। এ বিষয়ে হাদিস উল্লেখ করা হল।

"আবু হুরায়রা (রাদি.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: প্রাপ্তবয়স্কা নারীকে তার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না। কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না। নীরবতাই তার অনুমতি।" (সহীহ আত-তিরমিযি, ১১০৭)।

উপরে বর্ণিত হাদীসের উপর সাহাবা ও ইমামগণের মতামত বা ফিকাহ:

ওমর (রাদি.), ইবনু আব্বাস (রাদি.), আয়েশা (রাদি.) ও উরস ইবনু উমাইয়া (রাদি.) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। আবু হুরায়রা (রাদি.) হতে বর্ণিত হাদিসটিকে আবু ঈসা আত-তিরমিযি হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদিস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। তাদের মতে, প্রাপ্তবয়স্কা নারীকে তার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না। তার পিতা যদি তার প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতীত তাঁকে বিয়ে দেয় এবং সে মেয়ে যদি এ বিষয়ে পছন্দ না করে, তবে কুফার বেশিরভাগ আলিমের মতে বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। মদিনার একদল আলিমের মতে, যদি পিতা তাঁকে বিয়ে দেয় এবং তা যদি সে পছন্দ না করে তবুও এ বিয়ে জায়িয হবে। এই মত দিয়েছেন ইমাম মালিক (রহ.), শাফিঈ (রহ.), আহমাদ(রহ.) ও ইসহাক (রহ.)।

৩৮. এতিম মেয়েকে বিবাহ দেওয়া বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন।

পুরুষ অভিভাবকগণ তাদের অধিনস্থ মহিলাদের বিবাহ দেওয়ার ব্যপারে সেচ্ছা চারিতার আশ্রয় নিত। বিশেষ করে এতিম মেয়েদের বিবাহ বিষয়ে অনেক অনিয়ম করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর বানী:

"আর লোকেরা আপনার নিকট নারীদের সম্বন্ধে বিধান (ফাতওয়া) জানতে চায়। বলুন: আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে তোমাদের বিধান (ফাতওয়া) দিচ্ছেন এবং যা তোমাদের তেলাওয়াত করে শুনান হয়। কুরআনে তা ঐসব এতিম নারীদের সম্পর্কে যাদের তোমরা নির্ধারিত প্রাপ্য প্রদান কর না অথচ তোমরা তাদের বিয়ে করতে চাও এবং অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে, আর এতিমদের ব্যপারে ইনসাফের সাথে কার্য নির্বাহ করবে। আর তোমরা যে কোন ভাল কাজ কর আল্লাহ তো তা খুব জানেন।" (সূরা নিসা ৪: ১২৭)। "আবু হুরায়রা (রাদি.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: এতিম কুমারীর (বিয়ের) ব্যপারে তার নিজের মত নিতে হবে। সে চুপ থাকলে তবে এটাই তার সম্মতিগণ্য হয়ে যাবে। সে সরাসরি অস্বীকার করলে তবে তার উপর জোর প্রয়োগ করা যাবে না।" (সহীহ আত-তিরমিযি ১১০৯, আবু দাউদ ১৮২৫)।

এতিম কুমারী মহিলাদের বিয়ের বিষয়ে আলিমদের মতামত:

আবু মুসা (রাদি.), আয়েশা (রাদি.) ও ইবনু ওমর (রাদি.) হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। আবু হুরায়রা (রাদি.) হতে বর্ণিত হাদিসটিকে ইমাম আবু ঈসা আত তিরমিযি 'হাসান' বলেছেন। আলিমদের মধ্যে এতিম মেয়ের বিয়ের ব্যপারে কিছু মতানৈক্য আছে। একদল আলিমের মতানুযায়ী এতিম মেয়েকে বিয়ে দিলে সে বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তা স্থগিত থাকবে। বালেগ হওয়ার পর সে চাইলে এ বিয়ে বহাল রাখতে পারে অথবা নাকচ করে দিতে পারে। এই মত দিয়েছেন একদল তাবিঈ ও অপরাপর আলিম। আরেক দল আলিম বলেছেন, বালেগ না হওয়া পর্যন্ত এতিম মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না। কেননা, বিয়ের ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করা জায়িয নেই। এই মত দিয়েছেন, সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ ও অপরাপর আলিমগণ। আহমদ ও ইসহাক বলেছেন, নয় বছরে পদার্পণ করার পর এতিম বালিকাকে বিয়ে দেয়া হলে এবং সে এতে রাজী থাকলে তা জায়েজ হবে। বিয়ে বহাল রাখা বা ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষেত্রে বালেগ হওয়ার পর তার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। আয়েশা (রাদি.)-এর বিষয়কে তারা দলীল হিসাবে নিয়েছেন। আয়েশা (রাদি.)-কে নিয়ে তাঁর নয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাসর যাপন করেছেন। আয়েশা (রাদি.) বলেছেন, কোন বালিকা নয় বছরে পদার্পণ করলে সে মহিলা বলে গণ্য হবে।

৩৯. মহিলাদের বিবাহে মোহরানার অধীকার।

মোহরের সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যা প্রদান করার বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে বলেন: "আর তোমরা দিয়ে দাও স্ত্রীদের তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে, তবে তারা খুশি হয়ে মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তা তোমরা সানন্দে, তৃপ্তিসহকারে ভোগ কর।" (সূরা নিসা, ৪:৪)। **কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:** "স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের ওপর দায়িত্ব। আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে (স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেজগারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সবই অত্যন্ত ভাল করে দেখেন।" (সূরা বাকার, ২: ২৩৬-২৩৭)।

৪০. মোহরানা কম বা বেশী অবশ্যই দিতে হবে এ বিষয়ে হাদিস।

"সাহল ইবনু সা'দ (রাদি.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে একজন মহিলা বলল, আমি আপনার জন্য নিজেকে দান (হেবা) করলাম। (একথা বলে) সে অনেকক্ষন দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনার যদি তাকে প্রয়োজন না হয় তবে আমার সাথে তার বিয়ে দিন। তিনি বললেন: মহিলার মোহর আদায়ের মত তোমার নিকট কিছু আছে কি? সে বলল, আমার এ কাপড়টি ব্যতীত আমার নিকট আর কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: তাকে যদি তোমার কাপড়টি দাও তবে তোমাকে তো (ঘরে) বসে থাকতে হবে এবং তোমার কাপড় বলতে আর কিছু থাকবে না। অন্য কিছু খুঁজে নিয়ে আস। (কিছুক্ষন পর ফিরে এসে) সে বলল, কিছুই পাই নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: একটি লোহার আংটি হলেও খুঁজে নিয়ে এসো। বর্ণনাকারী বলেন, সে কিছুই খুঁজে পেল না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: কুরআনের কিছু জানা আছে কি তোমার? সে বলল: হ্যাঁ, অমুক অমুক সূরা জানি। সে সূরাগুলোর নামও বলল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: কুরআনের যেটুকু অংশ তোমার জানা আছে তার বিনিময়ে তোমার সাথে মহিলার বিয়ে দিলাম। (সহীহ আত-তিরমিযি, হাদিস- ১১১৪; সহীহুল বুখারী তা.পা. হাদিস- ৫১৪১)।

উল্লেখিত হাদীসের ফিকাহ:

এ হাদিসটিকে ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযি 'হাসান সহীহ' বলেছেন। এ হাদিস অনুযায়ী ইমাম শাফিঈ (রাহ.) মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিয়ের জন্য কোন লোকের নিকটে যদি মোহর আদায়ের মত কিছু না থাকে এবং যদি সে লোক কোন নারীকে কুরআনের কোন সূরার বিনিময়ে বিয়ে করে তবে তা জায়িয হবে। তার কর্তব্য হবে মহিলাকে সে সূরাটি শিখিয়ে দেয়া। কুফাবাসী আলিমগণ এবং আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, বিয়ে জায়িয হবে ঠিকই, কিন্তু তাকে 'মোহরে মিসাল' পরিশোধ করতে হবে। এটি হচ্ছে নিম্নতম মোহরানা। পাঠক স্মরণ রাখতে হবে রাসূল (ﷺ) যখন খাদিজা (রাদ.)-কে বিয়ে করেন তখন তাকে মোহরানা হিসাবে ২০ টি উট প্রদাণ করেছিলেন। বর্তমানে তার মুল্য কত হতে পারে ? (আর রাহীকাল মাখতুম)।

৪১. মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাকের সঠিক পদ্ধতি।

প্রতিটি মুসলিমের জন্য তালাক অপছন্দনীয় হালাল। তালাক কেউ আশা করে না কিন্তু কারও জীবনে কঠিন ভোগান্তি পেতে হয়। তালাকের শর্ত ও বিধি বিধানের প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে, 'সূরা তালাক' নামে কুরআন কারিমের একটি সূরাই আছে। তালাক দিতে হলে মহিলার স্বাস্থ্য, সময় ও শারীরিক সুস্থতা ইত্যাদি জেনে এবং মেনে তালাক দিতে হবে এবং আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের বাইরে যাওয়া মঙ্গল হবে না। এ বিষয়ে আল্লাহ কুরআনের সূরা তালাকে সতর্ক করেছেন:

"হে নবী! (উম্মতকে বলুন) তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। তুমি (যে তালাক দিবে) জান না, হয়তো আল্লাহ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন। অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দুই জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট।

আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সব কিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবর্তী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন। এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন। তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্যে সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গর্ভবর্তী হয়, তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পর জেদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে। বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিক প্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তদাপেক্ষা বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দেবেন।" (সূরা তালাক, ৬৫: ১-৭)। আল্লাহ কুরআনে আদেশ নিষেধ ও সতর্ক করেছেন এবং হাদিস দ্বারা ইহা বাস্তবায়িত করার কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন: "ইসমাইল ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) . . . আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদি.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে)-এর সময়ে তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলেন। উমর ইবনে খাত্তাব (রাদি.) এ বিষয়ে (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং নিজের কাছে রেখে দেয় যতক্ষন না সে মহিলা পবিত্র হয়ে পুনরায় ঋতুবতী হয় এবং আবার পবিত্র হয়। এরপর সে যদি ইচ্ছা করে, তাকে রেখে দেবে, আর যদি ইচ্ছা করে তবে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দেবে। আর ঐ তালাকের পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে আল্লাহ স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার বিধান রেখেছেন।" (বুখারী শরীফ ই.ফা. ৪৮৭৫)।

৪২. মহিলাদের তালাকের সুন্নত পদ্ধতি।

তালাকের কিছু শর্ত যেমন: হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষেধ। হামেলা বা পেটে সন্তান থাকা অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষেধ। একই সাথে তিন তালাক দেওয়া নিষেধ। রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষেধ ইত্যাদি। এরপরও যদি কেউ তালাক দেয়

তার জন্য বিধি বিধান রয়েছে। কুরআন ও হাদিস থেকে বিভিন্ন আদেশ নিষেধ অনুযায়ী সমস্যার সমাধান কারার ফিকাহ আছে।

(১) তালাকের বিধানে আল্লাহর বানী:

"তালাকে রেজয়ী' হলে দুবার পর্যন্ত, তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুত যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই হলো জালেম।" (সূরা বাকারা, ২: ২২৯)।

(২) তালাকের বিধানে আল্লাহর বানী:

"তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে না করে নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই। যদি আল্লাহর হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়।" (সূরা বাকারা, ২: ২৩০)।

(৩) তালাকের বিধানে আল্লাহর বানী:

"আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও, অথবা সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। আর যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আর আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না। আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের ওপর রয়েছে এবং তাও স্মরণ কর, যে কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে যার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়েই জ্ঞানময়।" (সূরা বাকারা ২: ২৩১)।

(৪) তালাকের বিধানে আল্লাহর বানী:

"আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্বস্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করো না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে

আল্লাহ ও কেয়ামত দিনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা বাকারা ২: ২৩২)।

আল্লাহ কুরআনে আদেশ নিষেধ ও সতর্ক করেছেন এবং হাদিস দ্বারা ইহা বাস্তবায়িত করার কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন।

"ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ ইবনে রাফি (রহ.) . . . ইবনে আব্বাস (রাদি.) এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে, আবু বকর (রাদি.)-এর যুগে ও ওমর (রাদি.)-এর খিলাফাতের প্রথম দু'বছর পর্যন্ত তিন তালাক এক তালাক সাব্যস্ত হত। পরে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাদি.) বললেন, লোকেরা একটি বিষয়ে অতি ব্যস্ততা দেখিয়েছে যাতে তাদের জন্য ধৈর্যের (ও সুযোগ গ্রহনের) অবকাশ ছিল। এখন যদি বিষয়টি তাদের জন্য কার্যকর সব্যস্ত করে দেই . . . (তবে তা-ই কল্যাণকর হবে)। সুতরাং তিনি তা তাদের জন্য বাস্তবায়িত ও কার্যকর সাব্যস্ত করলেন।" (সহীহ মুসলিম আ:হা. ৩৫৬৫; ই.ফা. ৩৫৩৭)।

৪৩. মহিলাদের কেহ তার বোনের তালাকের চেষ্টা করা নিষিদ্ধ।

মহিলাদের অবাধ মেলামেশা অনেক সময় তাদেরকে বিপদগ্রস্থ করে ফেলে। অনেক বোন তার নিজের বোনের ক্ষতি করে দুলা ভাইয়ের সাথে নিজেই দুলহান হতে চায়। এ ধরনের প্রচেষ্টা থেকে সাবধান করে আল্লাহর রাসূল বলেন:

"আবু হুরায়রা (রাদি.) হতে বর্ণিত আছে, নবী (১) বলেছেন: কোন নারী যেন বোনের পাত্র খালী করে নিজের পাত্র পূরনের জন্য তাঁর তালাকের চেষ্টা না করে।" (সহীহ আত-তিরমিযি, ১১৯০; আবু দাউদ ১৮৯১)।

ফিকাহ:

অনেক চালাক ও লোভি মেয়ে, ধনী বিবাহিত পুরুষের সাথে প্রেম ভালবাসার অভিনয় করে ঐ পুরুষকে তার পুর্বের স্ত্রী তালাক দিতে বাধ্য করে এবং নিজে সে স্থান দখল করার চেষ্টা চালায়। হাদিসের আলোকে এটি অবৈধ কাজ। বিয়ে করতে ইচ্ছা করলে প্রকাশ্য প্রস্তাব দিয়ে বিয়ে করবে। সর্বোচ্চ ৪ জন মহিলা একজন পুরুষকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু পূর্বের স্ত্রী তালাক দিতে বাধ্য করা এবং ঐ স্ত্রীর জীবন ক্ষতিগ্রস্থ করা সামাজিক অপরাধ এবং পাপের কাজ।

৪৪. মহিলাদের তালাক এবং স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত পালন।

তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের পুনরায় বিবাহ করার বিষয়ে কিছু শর্ত এবং কারণ আছে যাকে ইদ্দত বলে। তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দত বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে বলেন:
"আর তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেকে প্রতীক্ষায় রাখবে। তাদের পক্ষে গোপন রাখা বৈধ নয় যা আল্লাহ তাদের জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন, যদি তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হয়। আর যদি তারা আপোষ-মীমাংসা করতে চায় তবে ঐ সময়ে তাদের ফিরিয়ে নিতে তাদের স্বামীরা অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায় সংগত অধিকার আছে যেমন পুরুষদের আছে তাদের উপর। আর নারীদের উপর রয়েছে পুরুষদের মর্যাদা। আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ।" (সূরা বাকারা ২:২২৮)।
তালাকপ্রাপ্তা অথবা বিধবা মহিলাদের ইদ্দত বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে ৩টি অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন:
(১) "আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুস্রাব থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, যদি তোমরা তাদের ইদ্দত সম্পর্কে সন্দেহ কর তবে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস। আর এখনও ঋতুস্রাব হয় নি তাদেরও ইদ্দত তিন মাস। তবে গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত তাদের গর্ভের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার প্রত্যেক কাজ সহজ করে দেন।" (সূরা তালাক ৬৫:৪)।

<u>ইদ্দত বিষয়ে অনেক হাদিস থেকে একটি উল্লেখ করা হল:</u>
(২) "আবূ তাহির ও হারমুলাহ ইবনে ইয়াহিয়া (রহ.) . . . উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরক্কাম যুহরীকে নির্দেশ দিয়ে লিখলেন যে, তিনি যেন সুবায়'আহ বিনতে হারিস আসলামীর কাছে চলে যান। এরপর তাকে তার হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ফাতওয়া চেয়ে ছিলেন এবং তিনি তাকে যা বলেছিলেন তখন উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওতবাকে লিখে পাঠালেন যে, সুবায়'আহ তাকে জানিয়েছেন তিনি বনূ আমির ইবনে লুঈ গোত্রের সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী এবং বিদায় হজ্বের সময় ওফাত পান। সে সময়ে তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তার স্বামীর ইন্তিকালের পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। এরপর যখন তিনি নিফাস থেকে পবিত্র হলেন, তখন বিবাহের পয়গামদাতাদের জন্য সাজসজ্জা করতে লাগলেন। তখন আব্দুদ দার গোত্রের আবু সানাবিল ইবনে বাকাক নামক এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, মতলব কী ? আমি তোমাকে সাজসজ্জা করতে দেখতে পাচ্ছি! সম্ভবত তুমি বিবাহ প্রত্যাশী ? আল্লাহর কসম! চার মাস দশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পারবে না। সুবায়'আহ বললেন: যখন সে লোকটি আমাকে একথা বলল, তখন কাপড় পরিধান করে সন্ধ্যা বেলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে চলে গেলাম।

এরপর আমি তাঁকে সে বিষয়ে জানিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই আমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তিনি আমাকে আরও নির্দেশ দিলেন যে, আমি ইচ্ছা করলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি। ইবনে শিহাব (রহ.) বলেন, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই প্রসূতির জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে আমি দূষনীয় মনে করি না। যদিও সে তখন নিফাসের ইদ্দাত পালনরত থাকে। তবে নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পূর্বে স্বামী যেন স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম না করে।" (সহীহ মুসলিম, ই.ফা. ৩৫৮৪)।

৪৫. কন্যা সন্তানদের সাথে মাতা-পিতার সদাচার ও দয়ার ফজিলত।

মানুষ তাদের সন্তান লালন পালন, আদর স্নেহ দিয়ে বড় করবে ও সুশিক্ষা দ্বারা কর্মঠ করে গরে তুলবে এটাই সাভাবিক নিয়ম। হাদিসে এতিম ও মেয়েদেরকে দুর্বল বলা হয়েছে, বাস্তবে এদের উপর অধীক অন্যায়, জুলুম ও অত্যাচার করা হয়। এর প্রতিরোধে আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনেক বিধান ও পরামর্শ দিয়েছেন। এ **বিষয়ে হাদিস:** "আবু বাক্র বিন আবু শায়বাহ্ থেকে আবু উসমান থেকে হিশাম বিন উরওয়াহ্ থেকে তার পিতা (উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়ের) থেকে আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, কতক বেদুঈন নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললো, আপনারা কি আপনাদের শিশুদের চুমু দেন ? সাহাবীগণ বলেন হাঁ। তারা বললো, কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! আমরা চুমু দেই না। তখন নবী (ﷺ) বলেন: আল্লাহ্ যদি তোমাদের অন্তর থেকে দয়ামায়া তুলে নিয়ে ধাকেন তাহলেআমি আর কী করতে পারি।" (সুনান ইবনু মাজাহ্ ৩৬৬৫, সহীহুল বুখারী তা.পা. ৫৯৯৮, মুসলিম ২৩১৭, আহমাদ ২৩৭৭০,২৩৮৮৭, ...)।

৪৬. কন্যা সন্তানদের সাথে মায়ের স্নেহ ও দয়ার ফজিলত জান্নাত।

এ বিষয়ে হাদিস: "আবু বাক্র বিন আবু শায়বাহ্ থেকে মুহাম্মদ বিন বিশর থেকে মিসআর থেকে সা'দ বিন ইবরাহীম থেকে হাসান সা'সাআহ্ (রাদি.) থেকে আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্নিত, (সা'সাআহ্) বলেন, এক মহিলা তার দু'কন্যা সন্তানসহ আয়িশা (রাদি.)-এর নিকট এলো। তিনি তাকে তিনটি খেজুর দিলেন। সে তাদের প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিল এবং অবশিষ্ট খেজুরটিও দু'টুকরা করে তার দু'কন্যার মাঝে বন্টন করলো। আয়িশা (রাদি.) বলেন, এরপর নবী (ﷺ)- আসলে আমি তাঁর নিকট ঘটনা বর্ননা করলাম। তিনি বলেন: তুমি তো অবাক হচ্ছো, এর ফলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সুনান ইবনু মাজাহ্ ৩৬৬৮, সহীহুল বুখারী তা.পা. ১৪১৮, ৫৯৯৮, মুসলিম ২৬২৬, তিরমিযী ১৯১৫, আহমাদ ২৩৫৩৫,২৪০৫১,...)।

এ বিষয়ে ফিকাহ্-
জান্নাতে প্রবেশ করার প্রথম শর্ত হচ্ছে, শির্ক ও বিদাত বর্জিত পূর্ন ইমান। ইমান্দার সামান্য আমল করেও অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

৪৭. কন্যা সন্তানদের লালন-পালনে মাতা-পিতা জাহান্নাম থেকে পরিত্রান পাবে।

এ বিষয়ে হাদিস: "হুসায়ন ইবনুল হাসান আল-মারওয়াযী থেকে ইবনুল মুবারাক থেকে হারমালাহ্ বিন ইমরান থেকে আবূ উশানাহ্ আল-মু'আফিরী থেকে উকবা বিন আমির (রাদি.) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: কারো তিনটি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারন করলে, যথাসাধ্য তাদের পানাহার করালে ও পোশাক-আশাক দিলে, তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে।" (সুনান ইবনু মাজাহ্ ৩৬৬৯, সহীহাহ ৩৯৪ আহমাদ ১৬৯৫০)।
এ বিষয়ে ফিকাহ্-
শুধু কন্যা সন্তান হলে মন খারাব না করে আল্লাহ্র উপর পূর্ন ইমান রেখে, শির্ক ও বিদাত বর্জন করে ধৈর্যধারনের কারনে, সামান্য আমল করেও অবশ্যই জান্নাত পাওয়া যাবে। পুত্র সন্তানের সান্তনার তেমন কোন পুরুষ্কার নেই।

৪৮. স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা মহিলাদের ইদ্দত ও শোক পালনের বিধান।

এবিষয়ে কুরআনে আল্লাহ বলেন: "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করে, তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশদিন প্রতিক্ষা করবে। তারপর যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে নেবে, তখন বিধিমত তারা নিজেদের ব্যাপারে যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।" (সূরা বাকারা, ২: ২৩৪)।
এ বিষয়ে হাদিস: "ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া (রহ.) ... হুমায়দ ইবনে নাফি (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়নাব বিনতে আবু সালামা (রাদি.) তাকে এ তিনটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি (হুমায়দ ইবনে নাফি রহ.) বলেন, যায়নাব (রাদি.) বলেছেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু (ﷺ)-এর স্ত্রী উম্মু হাবিবাহ (রাদি.) এর পিতা আবূ সূফিয়ান ইন্তিকাল করেন তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম। আমি দেখতে পেলাম যে, উম্মু হাবিবাহ (রাদি.) হলদে বর্ণের মিশ্রিত সুগন্ধি আনলেন অথবা অন্য কোন প্রসাধনী চেয়ে পাঠালেন। এরপর তা থেকে একটি বালিকাকে নিজ হাতে লাগিয়ে দিলেন। এরপর তিনি তার কপালে হাত মুছে নিলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম!

আমার সুগন্ধি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে **ইমান** রাখে, সে মহিলার জন্য তার কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। তবে বিধবা তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে পারবে।" (সহীহ মুসলিম, ই.ফা. ৩৬৮৭)।

এ বিষয়ে ফিকাহ্-

মহিলাদের স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত পালন ও শোক পালন করা ওয়াজিব এবং অন্য কার মৃত্যুর পর ৩ দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়।

৪৯. স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করা নিষেধ।

এবিষয়ে কুরআনে আল্লাহ বলেন: "আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তারা (মৃত্যুর পূর্বে) স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে দিয়ে তাদের জন্য এক বছরের ভরন পোষনের অসিয়ত করে যাবে। কিন্তু যদি তারা নিজেরা বেরিয়ে যায় তবে বিধিমত তারা নিজেদের ব্যপারে যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। আর আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ। আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য বিধিবদ্ধ ভরনপোষন দেয়া মোত্তাকিদের উপর কর্তব্য।" (সূরা বাকারা, ২: ২৪০-২৪১)।

এ বিষয়ে হাদিস:

"যাইনাব বিনতে কা'ব ইবনে উজরাহ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদি.) এর বোন ফুরাইআহ বিনতে মালিক ইবনে সিনান (রাদি.) তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বনু খাদরায় তার পিতার বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এর নিকট এসে অনুমতি চাইলেন। তার স্বামী তার কয়েকটি পলাতক গোলামের সন্ধানে গিয়েছিলেন। অবশেষে তিনি আল-কাদুম সীমায় পৌছে তাদের দেখতে পেলেন। এরপর গোলামরা তাকে হত্যা করে ফেলে। তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট অনুমতি চাইলেন। মহিলা বললেন, আমি আমার পিত্রালয়ে ফিরে যেতে চাই। তিনি আমার জন্য তার মালিকাধীন বাসস্থান অথবা খোরপোষ রেখে যান নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রওয়ানা হয়ে হুজরা অথবা মসজিদ পর্যন্ত গেলে তিনি আমাকে ডাকলেন বা কাউকে দিয়ে ডাকালেন। তিনি আমাকে বললেন: তুমি কী বলেছিলে? তখন আমি আমার স্বামীর ঘটনাটি পুরাবৃত্তি করি। তিনি আমাকে বললেন: তুমি ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমার (স্বামীর) ঘরেই অবস্থান কর। মহিলাটি বললেন, আমি সেখানে চার মাস দশ দিন অতিবাহিত করলাম। উসমান ইবনে আফফান (রাদি.) তার যুগে আমার নিকট লোক পাঠিয়ে আমার ঘটনাটি

জানতে চাইলে আমি তাকে অবহিত করি, তিনি তা অনূসর করলেন এবং সেই অনুযায়ী বিধান জারি করলেন।" (আবু দাউদ, ২৩০০)।

এ বিষয়ে ফকিাহ্-

স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায় বিপদগ্রস্থ বিধবা মহিলাকে স্বামীর ঘর থেকে বের করে দেওয়া অপরাধ। একদিকে শোকাগ্রস্থা অপরদিকে সে মৃত ব্যক্তির একজন ওয়ারিসও বটে। পরিবারের বাকী ওয়ারিসদের প্রতি আল্লাহর হুকুম।

৫০. মহিলাদের তালাকদাতা স্বামীর সাথে পুনঃবিবাহের বিধান।

বিভিন্ন ভুল বোঝাবুঝির মাধ্যমে তালাক হয়ে থাকে। পরবর্তিতে স্বামী বা স্ত্রী পুনঃরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে কিছু জটিল শর্ত আছে। যা হাদিস থেকে শিক্ষা নেয়া যেতে পারে। স্ত্রী তার তালাক দাতা পূর্ব স্বামীর নিকট ফিরে যেতে চায় সে বিষয়ে হাদিস:

"আবূ তাহির ও হারমুলাহ ইবনে ইয়াহইয়া (রহ.) . . . উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রহ.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্ত্রী আয়িশা (রাদি.) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রিফা'আহ আল কুরাযী (রাদি.) তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং সে তাকে পুরাপুরি তালাক দিয়ে দেয়। অতঃপর সে মহিলা আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইর (রাদি.)-কে বিবাহ করে। এরপর সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সে ছিল রিফা'আর অধীনে। সে তাকে পুরাপুরি তিন তালাক দেয়। অতঃপর সে আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইর (রাদি.)-কে বিবাহ করে। আল্লাহর কসম, তার সাথে তো রয়েছে কাপড়ের ঝালরের মতো। এ বলে মহিলা তার উড়নার আঁচল ধরে দেখাল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হেসে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: তুমি সম্ভবত রিফা'আর নিকট ফিরে যেতে চাও ? না তা হয় না। যতক্ষন না সে তোমার স্বাদ গ্রহণ করে এবং তুমি তার স্বাদ গ্রহণ কর। আবু বকর (রাদি.) তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে বসা ছিলেন। আর খালিদ ইবনে আস (রাদি.) ছিলেন হুজরার দরজায় বসা। তাকে (ঘরে প্রবেশ করার) অনুমতি দেয়া হয় নি। রাবী বলেন, তখন খালিদ (রাদি.) আবু বকর (রাদি.)-কে ডেকে বললেন, আপনি কেন মহিলাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এ সব কথা প্রকাশ করা থেকে বারণ করলেন না।" (সহীহ মুসলিম, ই. ফা. ৩৩৯২)।

৫১. স্বামী তার তালাকপ্রাপ্তা পূর্ব স্ত্রীকে ফিরিরে নিতে চায়।

এবিষয়ে হাদিস: "আবূ বকর ইবনে আবূ শাইবাহ (রহ.) . . . আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। অতঃপর অন্য একজন তাকে বিয়ে করে। এরপর সে তাকে সঙ্গমের আগেই তালাক দিয়ে দেয়। পরে প্রথম স্বামী তাকে বিয়ে করতে চায় এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন: না, তা হবে না যে পর্যন্ত না তারা একে অন্যের স্বাদ গ্রহণ করবে। যেভাবে প্রথম স্বামী তার স্বাদ গ্রহণ করেছিল। (সহীহ মুসলিম, ই. ফা. ৩৩৯৬)।

৫২. মহিলাদের গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনীর সিয়াম।

গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী মহিলাদের সিয়াম মাফ করে দেয়ার হাদিস:
"আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব গোত্রের আনাস ইবনে মালিক (রাদি.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের উপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অশ্বারোহী বাহিনী হঠাৎ আক্রমন করল। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এলাম। তিনি বললেন: আমি তাকে সকালের খাবার খাওয়া রত অবস্থায় পেলাম। তিনি বললেন: কাছে এসো এবং খাও। আমি বললাম, আমি সিয়াম পালনরত আছি। তিনি বললেন: সামনে এসো। আমি তোমাকে সিয়াম প্রসঙ্গে কথা বলব। আল্লাহ্ মুসাফির লোকের সিয়াম ও অর্ধেক সালাত কমিয়ে দিয়েছেন আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদাণকারিনী মহিলাদের সিয়াম মাফ করে দিয়েছেন। আনাস (রাদি.) বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'জনের কিংবা একজনের কথা বলেছেন। আমার আফসোস এই যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে খাবার খাইনি।" (সহীহ আত-তিরমিযি ৭১৫)।

উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা বা ফিকাহ:
"আবূ উমাইয়্যা (রাদি.) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযি আনাস ইবনে মালিক আল-কা'বী (রাদি.) হতে বর্ণিত হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট হতে এই একটি মাত্র হাদিস ছাড়া তার (আনাস) সূত্রে বর্ণিত অন্য কোন হাদিস আছে বলে আমাদের জানা নেই। এই হাদিস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। অন্য একদল আলিম বলেন, গর্ভবতী ও দুগ্ধদাণকারিনী মহিলাগণ সিয়াম ভেঙ্গে ফেলবে। পরে এর কাযা আদায় করবে এবং (মিসকিনদের) খাওয়াবে। এরকম অভিমতই প্রকাশ করেছেন সুফিয়ান, মালিক, শাফিঈ ও আহমাদ (রাহ.)। অন্য আরেকদল আলিম বলেন এরা রোযা আদায় করবে না এবং মিসকীনদের খাবার খাওয়াবে। কাযা রোযা পালন করাটা

তাদের উপর জরুরী নয়। ইচ্ছা করলে কাযা আদায় করবে, তাহলে মিসকীন খাওয়াতে হবে না। এরকম অভিমত ইসহাকেরও।"

৫৩. মহিলাদের সন্তানের দুধপান বিষয়ে নিয়ম নিতী।

সন্তানের দুধ পান বিষয়ে কুরআনে উল্লেখ আছে এবং হাদীসের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ইসলামের নিয়ম অনুসারে জন্মসূত্রে যেমন রক্তের সম্পর্ক তেমনি দুধ পান করায় দুধ মা (জন্মদাতা মা ছাড়া অন্য মহিলা যে দুধপান করায়), দুধ ভাই ইত্যাদির সম্পর্ক হয় এবং বিবাহে এ বিষয়ে ব্যাধকতা আছে।

দুধ পানকারী সন্তানসহ স্ত্রীকে তালাক দিলে তাদের দুধ পান বিষয়ে আল্লাহর বানী:

"আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার ওপর সে সমস্ত নারীর খোর-পোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী হয়। কাউকে তার সামর্থের অতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। আর মাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। আর ওয়ারিশদের ওপরও দায়িত্ব এই। তারপর যদি পিতা-মাতা ইচ্ছা করে, তাহলে দু'বছরের ভেতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই। আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন পাপ নেই। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত ভাল করেই দেখেন।" (সূরা বাকারা ২: ২৩৩)।

৫৪. সন্তানকে কত দিন দুধ পান করাবে ? সে বিষয়ে আল্লাহর বানী।

"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভেধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু'বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।" (সূরা লোকমান ৩১: ১৪)।

৫৫. মহিলাদের হিজাব (পর্দা) বিষয়ে বিধান।

পর্দা ফার্সি শব্দ যার আরবি 'হিজাব'। বাংলা অনুবাদে ফার্সি পর্দা শব্দটিই প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত আছে। হিজাব অর্থ আড়াল বা আবরণ। ইসলামী পরিভাষায় হিজাব অর্থ শুধু পোশাকের আবরণই নয়, সামগ্রিক একটি সমাজ ব্যবস্থা। যাতে নারী পুরুষের মধ্যে

অপবিত্র, অবৈধ বা আবাঞ্চিত সম্পর্ক এবং নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারী আচরণ রোধের নানা ব্যবস্থা থাকে। দেহ দর্শনের মাধ্যমে পুরুষ নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। যা প্রতিহত করা অথবা আরও আকৃষ্ট করার জন্য পোশাকের ভুমিকা অস্বীকার্য। পোশাকের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য 'আউরাত' বা শরীরের গোপন অংশ আবৃত করা। যদি কোন পোশাক ডিজাইন, সঙ্কীর্ণতা বা অন্য কোন কারনে এই ফরয উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয় তাহলে তা পরিধান করা বৈধ নয়, তা যে পোশাকই হোক। পুরুষের সতর নাভি থেকে হাঁটুর নীচে এবং পায়ের টাখনুর উপর পর্যন্ত, তা হোক লুঙ্গি, ধুতি, পাজামা ও প্যান্ট দ্বারা আবৃত করা। এ ছাড়া শরীরের উপরের অংশ আবৃত করার জন্য নানারুপ আরবি, ভারতী ও ইউরোপিয় পোশাক আছে। বিস্তারিত জানার জন্য "ড.খন্দকার আবদুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর রচিত- (কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ সজ্জা) ৩৬৮ পৃষ্টার বইটি সংগ্রহ ও আধ্যায়ন করার জন্য অনুরোধ করছি।

হিজাব বা পর্দা যার অর্থ ব্যাপক। কুরআন থেকে এর উল্লেখ করা যেতে পারে। কুরআনে মুমিন-পুরুষ ও মুমিন-নারী উভয়দেরকে আল্লাহ্ জানিয়ে দেন:

(১) "মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ইমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা নূর ২৪:৩০-৩১)।

(২) "হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।" (সূরা আহযাব ৩৩: ৩২)।

(৩) "তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে- মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পুত-পবিত্র রাখতে।" (সূরা আহযাব ৩৩: ৩৩)।

(৪) "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (সূরা আহযাব ৩৩: ৫৯)।

৫৬. মহিলাদের পোশাক ও সতর ঢাকা সদা-সর্বদা আবশ্যক।

কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনার আলোকে জানা যায় যে, মুসলিম মহিলাদের 'সতর' ও পোশাকের বৈশিষ্টগুলি নিম্নরূপ থাকা আবশ্যক:

(১) সতর অর্থাৎ গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা।
মহিলাদের 'সতর অর্থাৎ গুপ্তাঙ্গ' দেহের কতটুকু তা নিয়ে নানা জনের নানামত এবং আজ পর্যন্ত কেহই একমত হতে পারেনি। তাই আমরা এ বিষয়ে ওহী বা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। পোশাকের বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন:
"হে বনী-আদম! আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক। এটি সর্বোত্তম বা উৎকৃষ্ট। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।" (সূরা আরাফ, ৭:২৬)।
সূরা নুরের ৩০ ও ৩১ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ বিশ্বাসী নারী-পুরুষদের চারিত্রিক পবিত্রতা ও সফলতার পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। সকল মুমিন নারী-পুরুষের উচিত সর্বদা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করা, বিশেষ করে যে সকল দৃশ্য মনের মধ্যে অস্থিরতা, পাপেচ্ছা বা অসংযমের অনুভুতি জাগিয়ে তোলে তা থেকে অবশ্যই নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ সবাইকে লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে এবং পবিত্র জীবন যাপন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেন আমরা গোপনে বা প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় সৎ ও পবিত্র থাকি, কারণ আল্লাহ্ সবকিছু দেখেন ও শুনেন।
সৎ ও পবিত্র জীবনের অন্যতম মাধ্যম শালীন পোশাক দ্বারা নিজের সৌন্দর্য-অলংকার আবৃত করা। তাই আয়াতে আল্লাহ্ বিশেষভাবে নারীদের পোশাক ও পর্দার বিধান দান করেছেন। স্বভাবতই যা প্রকাশিত বা সাধারণভাবে যা বেরিয়ে থাকে এমন সৌন্দর্য-অলংকার ছাড়া সকল সৌন্দর্য আবৃত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কোরআন ও হাদিসের নির্দেশনা থেকে ইমামগন ও ফকিহ্‌গণ উল্লেখ করেছেন মহিলাদের আউরাত বা সতর চার পর্যায়ে।

প্রথম পর্যায়: স্বামীর সামনে স্ত্রীর সতর- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন সতর নেই, পর্দা নেই, কোন পোশাকের বিধান নেই। আল্লাহ্ বলেন: "তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।" (সূরা আল-বাকারা ২:১৮৭ আয়াতের অংশ)।

দ্বিতীয় পর্যায়: অন্যান্য মহিলার সামনে সতর। একমাত্র মুসলিম নারীর সামনে সৌন্দর্য-অলংকার, নিজের মাথা, ঘার ইত্যাদি প্রদর্শনের অনুমতি আছে। ফকিহগনের মতে নারীর সামনে সতর পুরুষের সাথে পুরুষের সতরের মতই। অন্যান্য নারীদের দৃষ্টি, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত রাখা মুসলিম নারীর জন্য ফরয। বিশেষ কারনে দেহের বাকী অংশ অনাবৃত করা অনুমতি সাপেক্ষে। তবে অমুসলিম নারীর সাখে পুরুষের মতই পর্দা করবে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) বলেছেন: "আল্লাহ্র উপরে ও আখিরাতে উপরে ইমান স্থাপন করেছে এমন কোন নারীর জন্য বৈধ নয় যে, তার নিজের ধর্মের মহিলা ছাড়া অন্য কোন মহিলা তার আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ দর্শন করবে।" (বাইহাকী, আল-সুনানুল কুবরা ৭/৯৫, ইবনু কাসির তাফসির ৩/২৮৫)।

ইবনু আব্বাস (রাদি.) থেকেও হাদিস আছে।

তৃতীয় পর্যায়: রক্ত সম্পর্কের নিকটতম আত্মীয়ের সামনে সতর- ফকিহ্গণ উল্লেখ করেছেন যে, পিতা, শ্বশুর, ভ্রাতা, ও অন্যান্য নিকটতম আত্মীয় যাদের সাথে বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ তাদের সামনে মুসলিম রমণী নিজের শরীর আবৃত করে রাখবেন, তবে মুখ, মাথা, গলা, ঘার, বুক, বাজু, পা ইত্যাদি অনাবৃত রেখে তাদের সামনে যেতে পারেন। তবে প্রয়োজন ছাড়া যতটুকু সম্ভব আবৃত রাখতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ পর্যায়: অন্নান্য পুরুষের সামনে সতর- উপরে উল্লেখিত নিকটতম আত্মীয় ছাড়া সকল অনাত্মীয় পুরুষের সামনে মুসলিম মহিলার পুর দেহই 'আউরাত' বা আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ। কেবল মাত্র মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ছাড়া। ইমাম আবু হানিফা (রাহ.), ইমাম মালিক (রাহ.), ইমাম শাফিয়ী, (রাহ.), ইমাম তাবারী (রাহ.) ও অন্যান্য ইমাম ও ফকিহ্গণ বলেন, মুসলিম মহিলা তার মুখ ও হাত অনাবৃত রাখতে পারেন, তবে তা ঢেকে রাখা উত্তম। তাদের মতে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সর্বাবস্থায় মুখমণ্ডল আবৃত রাখাই সুন্নত ও উত্তম, তবে ফরজ নয়।

(২) ঢিলেঢালা স্বাভাবিক কাপড় পরা- একেবারে টাইট পোশাক যাতে শরীরের উচু নিচু প্রতীয়মান হয় এমন টেডি, চোষ্ট বা গেঞ্জী পোশাক দ্বারা সতর অর্থাৎ গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা হয় না। বরং এতে পুরুষ নারীর প্রতি আরও বেশী আকৃষ্ট হতে পারে ও অঘটনের কারণ হতে পারে।

(৩) অমুসলিম ও পাপিদের অনুকরণ না করা- ভিন্ন দেশী অমুসলিম নারীদের পোশাক যাদের পুরুষ নারীর পোশাকে তেমন পার্থক্য নেই এমন ধরনের পোশাক মুসলিম

মহিলাদের জন্য সতর অর্থাৎ গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা হয় না। এতে পুরুষ নারীর প্রতি ভিন্নভাবে আকৃষ্ট হয়ে অঘটন ঘটাতে পারে।

(৪) নারী-পুরুষের পোশাকের পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র বজায় রাখা- মহিলাদের পোশাক পুরুষের পোশাক থেকে ভিন্ন এবং মুসলিম হিসাবে পোশাকের বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য অনেক হাদীসের একটি হাদিস উল্লেখ করা হল:

"ইবনু আব্বাস (রাদি.) সূত্রে বর্ণিত। নবী (ﷺ) অভিশাপ দিয়েছেন যেসব নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং যেসব পুরুষ নারীদের বেশ ধারণ করে।" (আবু দাউদ ৪০৯৭)।

পোশাকের বিষয়ে ফিকাহ:

উপরের আয়াতে পোশাকের বিষয়ে তিনটি বিষয় উল্লেখ আছে। (১) শরীর ঢাকার জন্য সকল প্রকার পোশাকের ব্যবস্থা এবং বাড়তি সাজ-সজ্জার ব্যবস্থা আছে। (২) তাকওয়া বা পরহেজগারী পোশাকের ব্যবহারে উৎসাহ আছে। (৩) উত্তম বা উৎকৃষ্ট পোশাক। সব ধর্ম ও জাতীর মধ্যেই নারীপুরুষের বেশভুষা বা পোশাকে ভিন্নতা আছে।

৫৭. মহিলাদের গহনার উপর যাকাত দেয়ার আদেশ।

যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে স্ত্রী-পুরুষ সবার উপর যাকাত প্রদান ফরয। বিশেষ করে মহিলাদের মালিকানায় স্বর্ণ ও রুপার গহনার যাকাত নিয়ে সমস্যা হয়ে থাকে। প্রথমত: গহনার পূর্ণ মালিকানা নিয়ে, দ্বিতীয়ত কে যাকাত দিবে ? এ বিষয়ে হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে- "আমর ইবনে শুআইব (রাহ.) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, দুইজন মহিলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আসে। তাদের দুইজনের হাতে স্বর্ণের বালা ছিল। তিনি তাদের উভয়কে প্রশ্ন করেন: তোমরা কি এর যাকাত প্রদান কর? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: তবে তোমরা এর যাকাত প্রদান কর।" (আবু দাউদ, ১৩৯৬)।

৫৮. মহিলাদের বেঁচে থাকার অধিকার।

এক সময় মেয়েদেরকে জন্মের পর জীবন্ত কবর দেওয়া হত। বর্তমানে গর্ভাবস্থায় অসংখ্য ভ্রুনকে হত্যা করা হচেছ শুধু মেয়ে হওয়ার কারনে। মহিলাদেরকে যৌতকের দাবিতে হত্যা করা হচেছ, ধর্ষন করে হত্যা করা হচেছ। সভ্যতার যুগেও মহিলাগণ **বেঁচে থাকার** অধিকার থেকে বন্চিত। তাই আল্লাহ্ মানুষকে জানিয়ে দেন, কিয়ামতের

দিন ঐসব পুরুষদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে ও জিজ্ঞাসা করা হবে "যখন জীবন্ত প্রোথিত মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল ?" (সূরা তাকবীর ৮১:৮-৯)।

এই আয়াতে হত্যাকারীকে জিজ্ঞাসার কথা উল্লেখ করা হয় নি, কেন তুমি মেয়েকে হত্যা করেছিলে ? বরং মেয়েকে জিজ্ঞাসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ দুনিয়াতে হত্যাকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এর দ্বারা এ কথা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ ঐ হত্যাকারীর উপর অত্যন্ত রাগান্বিত এবং এটা যে এতো গুরুতর অপরাধ যা হত্যাকারীকে জিজ্ঞসাবাদ করার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: "নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্থ, যারা নিজেদের সন্তানদেরকে নিছক বোকার মতো কোনো প্রমাণ ছাড়াই না বুঝে হত্যা করছে।" (সূরা আনয়াম ৬:১৪০)। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: "তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না। আমি তাদেরকে রিজিক দেই এবং তোমাদেরকেও দেই। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা গুরুতর অপরাধ।" (সূরা বনি ইসরাঈল ১৭:৩১)।

কোনো মানুষকেই হত্যা করা যাবে না। বরং প্রতিটি মানুষকে এই সবুজ-শ্যামল পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কোন মানুষই যেন কন্যা সন্তান হিসাবে জন্ম করার অপরাধে তাকে হত্যা না করে। **বেঁচে থাকা**টা হল ইসলামের পক্ষ থেকে নারীর মৌলিক অধিকার।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার বিষয়ে হাদিস:

"হাকিম ইবনে মুআবিয়াহ আল-কুশাইরী (রাহ.) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো উপর স্ত্রীর কী হক রয়েছে ? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে। তুমি পোশাক পরিধান করলে তাকেও পোশাক দিবে। তার মুখমণ্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হলে ঘড়ের মধ্যেই রাখবে।" (আবু দাউদ, অনুচ্ছেদ-৪২: হাদিস ২১৪২)।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্য বিষয়ে হাদিস:

"আবূ হুরায়রা (রাদি.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: কোন স্বামী তার স্ত্রীকে তার সাথে বিছানায় শোয়ার জন্য আহবান করার পর যদি স্ত্রী না আসে এবং স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত মালায়িকাগণ ঐ স্ত্রীকে অভিস্পাত করতে থাকেন।" (আবু দাউদ, অনুচ্ছেদ-৪১: হাদিস ২১৪১)।

৫৯. মহিলাদের মালিকানা অধিকার-১।

মৃত স্বামীর সম্পত্তির অংশ স্ত্রী, কন্যা ও স্বামীর ভাইও পাবে। মহিলাদের সম্পত্তির অধিকারের কথা আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেন: "মাতা-পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। হোক তা অল্প কিংবা বেশী। তা অকাট্য নির্ধারিত অংশ।" (সূরা নিসা ৪:৭)। হাদিসে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনুসারে মৃত ব্যক্তির শুধু ২ কন্যা, স্ত্রী এবং ১ ভাই থাকলে; সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্য হতে ২ জন কন্যা ২/৩ অংশ, ১ জন স্ত্রী ১/৮ অংশ এবং মৃত ব্যক্তির ভাই বাকী অংশ পাবে।

এটা আল্লাহর রাসূলের বিধান। এ বিষয়ে হাদিস:

"মুসাদ্দাদ (রহ.) . . . জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাদি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সঙ্গে বের হয়ে আসওয়াক নামক স্থানে একজন আনসার মহিলার নিকট উপস্থিত হই। তখন সে মহিলা তার দু'টি কন্যা সন্তান নিয়ে এসে বলল, ইয়া রসুলুল্লাহ ! এ কন্যা দু'টি সাবেত ইবনে কায়স (রাদি.)-এর। যিনি আপনার সাথী থাকাকালে উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। এখন এদের চাচা এদের সমস্ত মাল ও মীরাছ দখল করে নিয়ে গেছে। এদের দু'জনকে কিছুই দেয় নি। বরং সে সব কিছু গ্রাস করেছে। ইয়া রসুলুল্লাহ! এখন এ ব্যপারে আপনি কী বলবেন ? আল্লাহর শপথ! যতক্ষন এরা সম্পদের অধিকারী না হবে, ততক্ষন এদের বিবাহ হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: আল্লাহ এ ব্যপারে ফয়সালা করে দেবেন। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যপারে ওসীয়াত করছেন। . . . তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: আমার নিকট ঐ মহিলা এবং তার দেবরকে ডেকে আন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মেয়ে দু'টির চাচাকে ডেকে বললেন: তুমি এদের (২ মেয়েকে) দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) দিয়ে দাও এবং এদের মাকে এক-অষ্টম (১/৮) অংশ দিয়ে দাও। আর যা অবশিষ্ট থাকে-তা তোমার।" (আবু দাউদ অধ্যয়- ১৩, ফারায়িয। হাদিস-২৮৮২)।

৬০. মহিলাদের মালিকানা অধিকার-২।

মৃত স্বামীর সম্পত্তি থেকে স্ত্রী, সন্তান ও স্বামীর পিতা-মাতা অংশ পায়। মৃত ব্যাক্তির সম্পত্তি থেকে জীবিত পিতা-মাতা প্রত্যেকে ১/৬ অংশ পাবে। জীবিত স্ত্রী ১/৪ অংশ, যদি সন্তান না থাকে। জীবিত স্ত্রী ১/৮ অংশ যদি সন্তান থাকে। অন্যদিকে মৃত স্ত্রীর

সম্পত্তি থেকে স্বামী ১/২ অংশ যদি সন্তান না থাকে এবং ১/৪ অংশ পাবে যদি সন্তান থাকে।

এ বিষয়ে হাদিস:

"ইবনে আব্বাস (রাদি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (প্রাথমিক অবস্থায় মৃতের ছেড়ে যাওয়া) মাল ছিল সন্তানাদির জন্য আর ওসিয়াত ছিল পিতা-মাতার জন্য। অতঃপর আল্লাহ তা থেকে কিছু রহিত করে দিয়ে অধিকতর পছন্দনীয় বিষয়টি প্রবর্তন করেছেন। পুরুষের জন্য দু'জন নারীর অংশের সমান নির্ধারন করেছেন। আর পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারন করেছেন। স্ত্রীর জন্য নির্ধারন (সন্তানের বর্তমানে) এক-অষ্টমাংশ এবং (সন্তানের অবর্তমানে) এক-চতুর্থাংশ। আর স্বামীর জন্য (সন্তানের বর্তমানে) অর্ধেক আর (সন্তানের অবর্তমানে) চার ভাগের একভাগ।" (সহীহ বুখারী তা.পা. ৬৭৩৯; ই.ফা. ৬২৮৩)।

৬১. মহিলাদের মালিকানা অধিকার-৩।

মৃত পিতার সম্পত্তির অর্ধেক মেয়ে ও অর্ধেক পিতার বোন পাবে। মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্ত্রী জীবিত না থাকায় অর্ধেক অংশ তার মেয়ে ও অর্ধেক অংশ মৃত ব্যক্তির ভাই না থাকায় বোন পাবে।

এর উপর হাদিস:

"আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ (রাহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইবনে জাবাল (রাদি.) আমাদের নিকট শিক্ষক অথবা আমীর হিসেবে ইয়ামানে আসলে আমরা তাঁর কাছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে এক কন্যা ও এক বোন রেখে মারা গেছে। তিনি কন্যাটিকে অর্ধেক ও বোনকে অর্ধেক দিলেন।" (সহীহ বুখারী তা. পা. ৬৭৩৪; ৬৭৪১, ই.ফা. ৬২৭৮)। "আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রাহ.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় মু'আয ইবনে জাবাল (রাদি.) ইয়ামানে অবস্থানকালে এক বোন ও এক কন্যার প্রত্যেককে মৃতের সম্পত্তির অর্ধেক অর্ধেক প্রদান করেছেন।" (আবু দাউদ, অধ্যয়-১৩ ফারায়িয, ২৮৯৩)।

৬২. মহিলাদের মালিকানা অধিকার-৪।

মহিলাদের মৃত নাতীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন। পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টন বিষয়ে কুরআনুল করীমে বিস্তারীত উল্লেখ থাকলেও নাতির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে দাদীর অংশ আছে। যা হাদিসে আছে। "আল-কানবী (রাহ.) . . . কাবিসা ইবনে যুওয়াব (রাদি.)

থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মৃত ব্যক্তির দাদী আবূ বকর সিদ্দীক (রাদি.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার মীরাছ (প্রাপ্য অংশ) দাবি করে। তখন তিনি বলেন: আল্লাহর কিতাবে তোমার কোন অংশের কথা উল্লেখ নেই এবং আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নত হতে তোমার ব্যপারে কোন কিছু অবহিত নই। অতঃএব এখন তুমি ফিরে যাও, এ সম্পর্কে আমি লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করব। তখন মুগিরা ইবনে শূ'বা (রাদি.) বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যখন তিনি দাদীকে এক-ষষ্ঠমাংশ ১/৬ প্রদান করেন। তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রাদি.) জিজ্ঞাসা করেন, ঐ সময় তোমার সঙ্গে আর কেউ ছিল কি ? তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রাদি.) দন্ডায়মান হন এবং ঐরূপ বলেন, যেরূপ মুগিরা ইবনে শূ'বা (রাদি.) বলেন। তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রাদি.) তার জন্য এক-ষষ্ঠমাংশ (১/৬) প্রদান করেন। অতঃপর অন্য এক মৃত ব্যক্তির দাদী (বা নানী) উমর ইবনে খাত্তাব (রাদি.)-এর নিকট (তার খিলাফতকালে) উপস্থিত হয়ে মীরাছ দাবি করে। তখন তিনি বলেন: আল্লাহর কিতাবে তো তোমার কোন অংশের কথা উল্লেখ নেই। তবে ইতোপূর্বে তুমি ব্যতীত অন্যদের ব্যপারে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে অর্থাৎ এক-ষষ্ঠমাংশ (১/৬), আর যেহেতু ফারাইযের ব্যাপার আমার পক্ষে বাড়াবাড়ি করাও সম্ভব নয়। তবে এক-ষষ্ঠমাংশ (১/৬) তুমি নিয়ে যাও। আর যদি নানী ও দাদী উভয়ই একত্রে জীবিত থাকে, তবে ঐ এক-ষষ্ঠমাংশ (১/৬) তোমাদের দু'জনের জন্য। আর তোমাদের দু'জনের একজন যদি হও, তবে সে ঐ অংশ পাবে।" (আবু দাউদ, অধ্যয়- ১৩ ফারায়িয, হাদিস ২৮৮৪)।

৬৩. মহিলাদের মালিকানা অধিকার-৫।

পিতা-মাতা হতে সন্তানের উত্তরাধিকার। পিতা-মাতা হতে সন্তানের উত্তরাধিকার বিষয়ে সহীহ বুখারী হাদিস বইয়ে একটি অধ্যায় লিখিত আছে। এর মধ্যে থেকে হাদিস উল্লেখ করা হল। "ইবনে আব্বাস (রাদি.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: সুনির্দিষ্ট অংশের হকদারদের মীরাছ পৌছে দাও। অতঃপর যা বাকী থাকবে তা (মৃতের) নিকটতম পুরুষের জন্য।" (সহীহ বুখারী তা.পা. ৮৫/৫ অধ্যয়: পিতা-মাতা সন্তানদের উত্তরাধিকার।)।

উল্লেখিত হাদীসের ফিকাহ:

"যায়েদ ইবনে সাবিত (রাদি.) বলেন, কোন পুরুষ বা নারী, কন্যা রেখে গেলে সে অর্ধাংশ পাবে। যদি তারা সংখ্যায় দুই বা তার অধিক হয় তারা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩)। আর তাদের সাথে যদি পুরুষ অংশীদার থাকে তাহলে প্রথমে যাদের অংশ

সুনির্দিষ্ট আছে তাদের থেকে শুরু করতে হবে। আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা এক পুরুষ দুই নারীর সমান পাবে ভিত্তিতে বণ্টন করতে হবে।" (সহীহ বুখারী, তা.পা. ৬৭৩২)। "সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাদি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মক্কায় এমন অসুস্থ হয়ে পড়লাম যে মরণের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেবা করার জন্য আমার কাছে আসলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার অনেক ধন-সম্পদ আছে। আর আমার এক মেয়ে ব্যতীত আর কোন উত্তরাধিকারী নেই। আমি কি আমার মালের দুই তৃতীয়াংশ দান করে দেব? তিনি বললেন: না। আমি বললাম, তাহলে কি অর্ধেক দান করব? তিনি বললেন: না। আমি বললাম, এক তৃতীয়াংশ কি দান করব ? তিনি বললেন: এক তৃতীয়াংশ তো অনেক। তুমি তোমার সন্তানকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাবে সেটাই উত্তম। তাকে এমন অভাবগ্রস্থ রেখে যাওয়ার চেয়ে যে অবস্থায় সে মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করবে। তুমি (পরিবার-পরিজনের জন্য) যা খরচ করবে তার বিনিময় তোমাকে দেয়া হবে। এমন কি যে লোকমাটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও বিনিময় দেয়া হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার হিজরত (এর পুন্য) থেকে পেছনে পড়ে যাব ? তিনি বললেন: তুমি কখনো আমার পিছনে পড়ে থাকবে না। তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে আমলই করবে তাতে তোমার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি হবে। সম্ভবত তুমি আমার পরও জীবিত থাকবে। এমন কি তোমার দ্বারা অনেক গোত্র উপকৃত হবে এবং অন্যরা হবে ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু সাদ ইবনে খাওলা (রাদি.)-এর জন্য আফসোস! মক্কাতেই তার মৃত্যু হেয়েছিল। সে কারনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সুফিয়ান (রাহ.) বলেন, সাদ ইবনে খাওলা (রাদি.) বনু আমির ইবনে লুআই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।" (সহীহ বুখারী তা.পা. ৬৭৩৩; ই.ফা. ৬২৭৭)।

৬৪. মহিলাদের কর্ম ও সমাজিক মর্যাদা ও অধিকার।

ইসলামের পূর্বে মহিলাদের ব্যক্তিগত ও সমাজিক মর্যাদা ছিল না বললেই চলে। মহিলাদের কৃতদাসী হিসাবে বেচা কেনা এবং ভাড়া খাটানো হত। ইসলাম মহিলাদের পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। যে সব দেশ বর্তমানে নিজেদেরকে সভ্য মানুষ বলে দাবি করে তারাও মহিলাদেরকে সামান্যতম মর্যাদা দিতে পারে নি। শুধু সমান অধিকারের নামে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়েছে। তারা মা, দাদী, নানী, বোন, স্ত্রী ও সন্তান হিসাবে পূর্ণ মর্যাদা, সম্মান ও সম্পদের মালিকানার অধিকার দিতে পারে নি। নগ্নতা ও যৌন স্বাধীনতার নামে পুরুষরাই তাদের সবকিছু ভোগ করছে।

আল্লাহ্ সমস্ত চিন্তাশীল পুরুষ জাতীর উদ্দেশ্যে বলেন: "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ কর এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া। নিশ্চয় এতে ঐ সকল লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে।" (সূরা রূম ৩০:২১)।

রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ গ্রহনের সুযোগ দিয়ে মহিলাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার অধীকার দেয়া হয়েছে। "আনাস (রাদি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মু সুলাইমকে এবং কতিপয় আনসার মহিলাকে যুদ্ধে নিয়ে যেতেন। তারা মুজাহিদদের পানি সরবরাহ করতেন এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন।" (আবু দাউদ, অনুচ্ছেদ-৩৪ যুদ্ধে নারীদের অংশ গ্রহণ, হাদিস ২৫৩১)।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন-

"পৃথিবীতে যা কিছু মহান চির কল্যানকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"

৬৫. যুবক ও যুবতীর বিয়ে শাদী ও ঘর সংসার করার অধিকার।

"আনাস ইবনে মালিক (রাদি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্ত্রীদের বাড়িতে আসল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো, তখন তাদের ইবাদতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে আমাদের তুলুনা হতে পারে না। কারণ, তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতভর সালাত (নামাজ) আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সব সময় সাওম (রোজা) পালন করব এবং কখনও বাদ দেব না। অপর একজন বলল, আমি নারী সংসর্গ ত্যাগ করব, কখনও বিয়ে করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, তোমরা কি ঐ সব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশী অনুগত। অথচ আমি সাওম পালন করি। আবার তা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি এবং নিদ্রা যাই ও মেয়েদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষন করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।" (সহীহুল বুখারী, তা.পা. ৫০৬৩; ই.ফা. ৪৬৯৩)।

উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা:

(১) যে কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে ইবাদতের সময়, পরিমান, স্থান, অবস্থা ইত্যাদির দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আবেগ জড়িত হয়ে ফরযের মধ্যে যেমন কম বেশী করা যাবে না; তেমনি সুন্নাতের ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ বা তাঁর আমলের পরিবর্তন করা যাবে না। নফল ইবাদতেও কারো সময় থাকলে বা খেয়াল খুশি মত করা ইসলাম সমর্থিত নয়। ইসলামে সালাত, সাওমের পাশাপাশি ঘুম, বিয়ে করা, বানিজ্য করা ইত্যাদিও ইসলামের মধ্যে গণ্য, যদি সাওয়াবের আশায় এবং সঠিক নিয়মানুসারে পালন করা হয়। যদি কেউ সার্বিক দিক থেকে সামর্থ হওয়া সত্ত্বেও রাসূলের সুন্নাতের প্রতি অনীহা ও অবিশ্বাসের কারণে বিয়ে পরিত্যাগ করে, তাহলে সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তরীকা থেকে বিচ্ছিন্ন বা খারিজ হয়ে যাবে।

(২) আল্লাহ মানুষকে যে প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সেগুলোকে উপেক্ষা করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া তো দুরের কথা, মানুষ মানুষের স্তরেই থাকতে পারবে না। মানুষ অতিরিক্ত খাদ্য খেলে বা একেবারেই খাদ্য ত্যাগ করলে তার বেঁচে থাকা নিয়েই আশঙ্কা দেখা দিবে। একাধারে সাওম পালন করলেও একই অবস্থা দেখা দিবে। তাই আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে এমন শিক্ষা দিয়েছেন যাতে আমরা মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেত পারি। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করলে দুর্ভোগ ও বিপর্যয় আসবে। পাদ্রী, সন্যাসী, বৈরাগ্যবাদী সুফি ধার্মিকতার নামে দাম্পত্য জীবনের প্রতি লোক-দেখানো অনীহা তাদের অনেককেই যৌনচারের ক্ষেত্রে পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। যা প্রতি দিনের খবরে পাওয়া যায়।

ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র বৈধ পন্থা হল বিবাহ। পরিবার গঠন, সংরক্ষণও বংশ বিস্তারের জন্য বিয়ে ছাড়া আর কোন বিধি সম্মত পথ নেই। এর মাধ্যমেই ব্যক্তি ও পারিবারক জীবন পবিত্র, কুলষমুক্ত ও নৈতিকতার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হতে পারে। এ জন্য ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করলে আল্লাহর চিরাচরিত বিধান এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত হিসাবে বিয়ে করা ফরয। এই হাদিস থেকে পাওয়া যায়, যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত বহির্ভূত অন্য মত ও পথকে ইসলামের নামে সংযোজন করেছে তারাই শিয়া খারেজী। চতুর্থ খলিফা আলী (রাদি.)-এর সময় শিয়া খারেজী দলের শুরু হয় ইরাকের কুফা এলাকায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পরে।

৬৬. যুবক যুবতীর বহু-বিবাহের অধিকার।

বিবাহ করা কখনও ফরয এবং কখনও সুন্নাত হয়। ইসলামে বহু বিবাহের অনুমতিও আছে। আত্মীয়দের মধ্যে যাদের সাথে বিবাহ জায়েয আছে কুরআনে আল্লাহ তার বিধান দিয়েছেন: "হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ত করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, মামাতো বোন ও খালাতো বোনকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে তাও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য। অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূরা আহযাব ৩৩:৫০)।

৬৭. বিবাহের বিষয়ে অনেক হাদীসের মধ্যে একটি উল্লেখ করা হল।

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে আমরা কতক যুবক ছিলাম। আর আমাদের কোন কিছু ছিল না। এই অবস্থাতে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। যার বিয়ে করার সামর্থ নেই, সে যেন সাওম পালন করে। কেননা, সাওম তার যৌনতাকে দমন করবে।" (সহীহুল বুখারী, তা.পা. ৫০৩৬; ই.ফা. ৪৬৯৬)।

উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা:

(১) হাদিসে 'যুব সম্প্রদায়' কাদের বলা হয়েছে? এ সম্পর্কে ইমাম নববী লিখেছেন, আমাদের লোকদের মতে যুবক-যুবতী বলতে তাদেরকে বোঝানা হয়েছে, যারা বালেগ অর্থাৎ ৩০ বছর পার করে নি। আর এ যুবক-যুবতীদের বিয়ের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকীদ করলেন কেন? তার কারন সম্পর্কে আল্লামা বদরউদ্দীন আইনী তার বিশ্ববিখ্যাত বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ 'উমদাতুল ক্বারী' গ্রন্থে লিখেছেন: হাদিসে কেবলমাত্র যুবক-যুবতীদের বিয়ে করতে বলার কারণ, যে বুড়োদের অপেক্ষা এ বয়সের লোকেদের মধ্যেই বিয়ে করার প্রবণতা ও দাবী অনেক বেশী বর্তমান দেখা যায়।

যুবক-যুবতীদের বিয়ে যৌন সম্ভোগের পক্ষে খুবই স্বাদপূর্ণ হয়। মুখের গন্ধ খুবই মিষ্টি হয়। দাম্পত্য জীবন যাপন খুবই সুখকর হয়। পারস্পরিক খুব আনন্দদায়ক হয়। স্পর্শ খুব আরামদায়ক হয় এবং স্বামী বা স্ত্রী তার জুড়ির চরিত্রে এমন কতগুলো গুন সৃষ্টি করতে পারে যা খুবই পছন্দনীয়। আর এ বয়সের দাম্পত্য ব্যাপার প্রায়ই গোপন রাখা

ভাল লাগে। যুবক বয়স যেহেতু যৌন সম্ভোগের জন্য মানুষকে উদগ্রীব করে দেয়। এ কারণে তার দৃষ্টি যে কোন মেয়ের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে এবং সে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় পড়ে যেতে পারে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এ বয়সের ছেলে-মেয়েকে বিয়ে করতে তাকীদ করেছেন এবং বলেছেন: বিয়ে করলে চোখ যৌন সুখের সন্ধানে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবে না এবং বাহ্যত তার কোন ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না।

"আতা (রহ.) বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রাদি.)-এর সঙ্গে 'সারিফ' নামক স্থানে মাইমূনাহ (রাদি.)-এর জানাযায় হাজির ছিলাম। ইবনে আব্বাস (রাদি.) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহধর্মিনী (স্ত্রী)। কাজেই যখন তোমরা তাঁর জানাযাহ উঠাবে তখন ধাক্কাধাক্কি এবং তা জোরে নাড়া-চাড়া করো না। বরং ধীরে ধীরে নিয়ে চলবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নয়জন সহধর্মিনী ছিলেন। আট জনের সাথে তিনি পালাক্রমে রাত্রী যাপন করতেন। আর একজনের সঙ্গে রাত্রী যাপনের পালা ছিল না।" (সহীহুল বুখারী, তা.পা. ৫০৬৭; ই.ফা. ৪৬৯৭)।

(যার পালা ছিল না, তিনি ছিলেন সাউদা বিনতে যামআ (রাদি.)। বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি নিজের পালা ছেড়ে দিয়ে তা 'আয়িশা (রাদি.)-কে দান করে ছিলেন।)

৬৮. হাদীসের আলোকে ইসলামে একাধিক বিবাহের কিছু কারণ এবং অনুমতি আছে।

ইসলাম হচ্ছে সকল জ্ঞানের কেন্দ্র এবং সব কিছুর মালিক আল্লাহর দেয়া পুর্নাঙ্গ জীবন বিধান। খালিকের বিধানের উপর মাখলুকের কোন আপত্তি চলে না। পুরুষ কিছু শর্ত সাপেক্ষে সর্বোচ্চ চার জন স্ত্রী রাখতে পারে। শর্ত পুরন করতে না পারলে মাত্র একজন স্ত্রী যথেষ্ঠ। এটি খালিক ও মালিকের বিধান। মহিলাদের ব্যক্তিগত অসুবিধার কারনে তাদের স্বামী থেকে খোলা-তালাক নিয়ে ইদ্দত পালনের পর অন্য পুরুষকে বিবাহ করার বিধান আছে। স্বামী মারা গেলে, ইদ্দত পালনের পর অন্য পুরুষকে বিবাহ করার বিধান আছে। ইহাই মহিলাদের বহু বিবাহ।

(১) কোন পুরুষ যখন দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর কারণে সন্তান থেকে বঞ্চিত থাকে, তখন দ্বিতীয় মহিলাকে বিবাহ করার অনুমতি পেতে পারে। এ জাতীয় কারণে মহিলা তার স্বামী থেকে খোলা-তালাক নিয়ে দ্বিতীয় নতুন পুরুষকে বিবাহ করার অনুমতি আছে।

(২) স্ত্রী যদি চিররুগ্না হয়ে পরে কিংবা পাগল হয়ে যায় অথবা বয়সের কারণে যৌনকর্মে আসক্তিহীন হয়ে যায় তখন দ্বিতীয় মহিলাকে বিবাহ করার অনুমতি আছে।

অনুরুপ কারণে মহিলা তার স্বামী থেকে খোলা-তালাক নিয়ে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি পেতে পারে।

(৩) বিভিন্ন সময় গৃহ-যুদ্ধ, বিশ্ব-যুদ্ধ ও স্বাধীনতা যুদ্ধে অধিকাংশ সময় পুরুষগনই বেশী মারা যায়। এ সময় পুরুষগনকে অধিক বিবাহের অনুমতি দিয়ে মহিলাদের সমস্যার সমাধান করার ব্যবস্থা রয়েছে।

(৪) কিছু পুরুষকে আল্লাহ অধিক শক্তিশালী করে সৃষ্টি করেছেন। তাদের যৌনকর্মের জন্য একজন স্ত্রী যথেষ্ট নয়। এর সমাধানে ঐ জাতীয় পুরুষের জন্য বহু বিবাহের (অনুর্ধ ৪ জন) জায়েয আছে।

(৫) অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সাংসারিক কাযকর্মে সাহয্য করার জন্য পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী (অনুর্ধ ৪ জন) গ্রহনের অনুমতি আছে। সমস্ত জগতের মালিক আল্লাহ। তিনি মানুষের স্রষ্টা। মানুষের উপকারের জন্য যে জীবন বিধান দিয়েছেন তা অপছন্দ বা অস্বীকার করা কখনও মঙ্গলজনক নয়। যদি কোন নারী-পুরুষ এই সব বিধানকে পালন করতে অনিহা, ঘৃনা, অবজ্ঞা বা অস্বীকার করে তাহলে তাদের **ইমান** ভঙ্গ হওয়ার আশংখা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বহু বিবাহের কারণ অন্য মুমিনদের থেকে অনেক ভিন্ন। তাঁর জীবনি থেকে জানা যায়, তিনি ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়স্কা পৌঢ়া ব্যবসায়ী খাদিজাতুল কুবরা (রাদি.)-কে বিবাহ করেন। ২৫ বছর পরিতৃপ্তিময় দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। ফাতিমা (রাদি.) সহ সকল সন্তান এ ঘরেই জন্ম নেয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ৫০ বছর বয়সে প্রথম স্ত্রী খাদিজা (রাদি.) ইন্তেকাল করেন। এরপর তিনি সাওদা (রাদি.) নামের এক বয়োবৃদ্ধাকে বিয়ে করেন এবং ৪ বছর যাবত এই বয়োবৃদ্ধাই তাঁর একমাত্র স্ত্রী ছিলেন। ৫২ বছর বয়সে মাতৃভুমি মক্কা ছেড়ে মদিনাতে হিজরত করেন। এখানেও ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য হাজার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। একের পর এক ষড়যন্ত্র, আক্রমন, যুদ্ধ এবং ইসলামের বিধি বিধান বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব পালনে ব্যস্ততার মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। পুরাতন অশিক্ষিত আরব জনগোষ্ঠিকে সভ্য জাতী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পুরুষ শিক্ষকের সাথে নারী শিক্ষকেরও প্রয়োজন ছিল। অথচ ইসলামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করা হয়। নারীদের জন্য বিশেষ বিধি-নিষেধসমূহ শিক্ষা ও প্রচারের জন্য আল্লাহ তাঁকে নানা বয়সের মহিলাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করান এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ দেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ৫৪ বছর বয়সে আয়িশা (রাদি.)-এর বিবাহ হয় এবং ৯ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত দাম্পত্য জীবনের সাথে ইসলামের নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-

এর ওফাতের পর; ৪৫ বছর পর্যন্ত হাদিস শিক্ষাদানের সাথে ইসলামের দাওয়াতের জন্য মহিলা শিক্ষক এবং মহিলা দায়ী তৈরীর কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

আরবদের কুসংস্কারের মদ্ধ্যে কিছু ভাল দিকও ছিল। আরব ঐতিহ্য অনুযায়ী জামাতা কেবল কনের পরিবারের নয়, গোটা গোত্রেরই জামাতা হত এবং জামাতার সঙ্গে লড়াই সংঘর্ষ করা ছিল অত্যান্ত লজ্জাস্কর ব্যাপার। কোন গোত্র ও পারিবারের মহিলার সাথে অন্য গোত্র ও পারিবারের পুরুষের বিবাহ বন্ধন হলে, বিবাহ সুত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ ও শত্রুতা লাঘব হত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বহু গোত্রের মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে এর সুফল দেখা যায়। আবু বকর সিদ্দিক (রাদি.)-এর মেয়ে আয়িশা (রাদি.), ওমর বিন খাত্তাব (রাদি.)-এর মেয়ে হাফসা (রাদি.)কে বিয়ে করে তাদের পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক দৃঢ় হয়েছিল। উম্মু সালামা (রাদি.)-এর বিবাহে আবু জাহেল ও খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে শত্রুতা কিছুটা লাঘব হয়েছিল। আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মু হাবিবাহ (রাদি.)কে বিয়ে করার পর আর কোন দিন তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। সাফিয়া ও জুওয়াইরিয়া (রাদি.) দুজনই ইহুদী পরিবারের মেয়ে ছিলেন। তাদেরকে যুদ্ধ বন্দি থেক মুক্তি দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন তাদেরকে বিয়ে করেন তখন ইহুদীদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে এবং শত্রুতাও কমে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিবিগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিসা ছিলেন আয়িশা (রাদি.)। তাহলে আশা করি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বহু বিবাহের কারণ বুঝতে সহজ হল।

৬৯. যার সাথে যার মুহাব্বত তার সাথে তার কিয়ামত।

“আনাস ইবনে মালিক (রাদি.) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কবে হবে ? রাসূল (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন: কিয়ামতের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি নিয়েছ ? সে বললো আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসা। এবার তিনি (রাসূল) বললেন, তাহলে তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই তখন থাকবে। আনাস ইবনে মালিক (রাদি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বানী ‘তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই’-শুনে আমি যতটুকু আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হয়েছি ইসলাম গ্রহনের পর এ চেয়ে বেশী আর কোনদিন আনন্দিত হইনি। কারন আমি আল্লাহ্, তার রাসুল, আবু বকর ও উমার (রাদি.) কে ভালবাসি। তাই

আমি আশা রাখি যে, আমিও তাদের সাথে কিয়ামতে দিন সথী হবো। যদিও আমি তাদের মত আমল করতে পারিনি।" (সহীহ মুসলিম বা.ই.সে. ৬৫২৪)।

ফিকাহ:

কোন অলী আওলিয়া ভন্ড ফকির (মৃত ও জীবিত) দেরকে মুহাব্বত না করে একমাত্র আল্লাহ্, তার রাসুল (ﷺ)-কে মুহাব্বত করে কুরআন ও হাদীস মোতাবেক চললে কিয়ামতে দিন রাসুল (ﷺ)-এর শাফায়াত পাওয়া যাবে এবং জান্নাতের আশা করা যায়। দুনিয়ার জীবনে বন্ধু ও সাথী নির্বাচনে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

৭০ সৎসঙ্গ স্বর্গ বাস অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ।

"আবু মূসা (রাদি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ মিস্ক (সুগন্ধি আতর) বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতাদের থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে না। হয় তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।" (সহীহুল বুখারী তা.পা.২১০১, আ:প্র. ৫৫৩৪, ই.ফা. ১৯৭১)।

ফিকাহ:

জীবন চলার পথে বন্ধু ও সাথী নির্বাচনে অবশ্যই চিন্তা ভাবনা এবং যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ভাবাবেগে তারাহুরা করে ক্ষনিকের ভালবাশার ফাদে পড়ে অনেক 'সরল প্রানকে' গ্লানি ও দু:খ নিয়ে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে।

৭১. সাদাকা বা দানের ফাযীলাত যদিও তা এক টুকরা খেজুর হয়।

"আদী ইবনু হাতিম (রাদি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) জাহান্নামের আগুনের কথা উল্লেখ করলেন। তারপর তাথেকে আশ্রয় চাইলেন এবং তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলিন। পরে আবার জাহান্নামের আগুনের কথা উল্লেখ করলেন, তারপর তাথেকে আশ্রয় চাইলেন এবং তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলিন। শুবাহ্ (রহ.) বলেন: দু'বার যে বলেছেনে, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তার পর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন: তোমরা জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচ এক টুক্রা খেজুর দিয়ে হলেও। আর যদি তা না পাও, তবে সুমিষ্ট ভাষার বিনিময়ে। (সহীহুল বুখারী, তা.পা. ৬০২৩; ১৪১৭; আ:প্র. ৫৫৮৯, ই.প্র ৫৪৮৫)।

ফিকাহ্:
আবু হুরায়রা (রাদি.), রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, সুমিষ্ট ভাষাও সাদাকাহ।

৭২. পুণ্যের আশায় পরিবারের জন্য খরচে সাদাকার ফাযীলাত।

"আবু মাস'উদ (রাদি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) **বলেছেন: মানুষ স্বীয় পরিবার পরিজনরে জন্য পুণ্যের আশায় যখন ব্যয় করে তখন সেটা তার সাদাকাহ্ হয়ে যায়।** (সহীহুল বুখারী, তা.পা. ৫৫, ৪০০৬, ৫৩৫১; আ:প্র. ৫৩, ই.ফা. ৫৩)।

ফিকাহ্:
সহী মুসলিম হাদিস-২৬২৬-তে উল্লেখ আছে সৎ কাজের কোন কিছুকেই তুচ্ছ মনে করো না, যদি তা তোমার ভাইয়ের সাথে হসিমুখে সাক্ষাতের দ্বারাও হয়।

৭৩. স্বীয় পরিবার ও সম্পদকে বদ-দু'আ করা নিশেধ।

"জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাদি.) সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: তোমরা নিজেদেরকে বদ-দু'আ কর না, তোমাদের সন্তানদের বদ-দু'আ কর না, তোমাদের খাদিমদের বদ-দু'আ কর না, তোমাদের ধন-সম্পদের উপরও বদ-দু'আ কর না। কেননা ঐ সময়টি আল্লাহ্র পক্ষ হতে কবুলের মুহুর্তও হতে পারে, ফলে তা কবুল হয়ে যাবে।" (সহী ও যইফ সুনান আবু দাউদ, ১৫৩২, মুসলিম।)

ফিকাহ্-
মহিলাদের মধ্যে আবেগ বেশী। তার মনমত কিছু না হলে সে রেগে যায় এবং অভিষাপ দিতে থাকে।

৭৪. কোন মহিলা তার প্রতিবেশী মহিলাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না।

"আবু হুরায়রা (রাদি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশী মহিলা যেন তার প্রতিবেশী মহিলাকে (হাদিয় ফেরত দিয়ে) হেয় প্রতিপন্ন না করে। তা ছাগলের পায়ের ক্ষুরই হোক না কেন।" (সহীহুল বুখারী, তা.পা. ৬০১৭,২৫৬৬; আ:প্র. ৫৫৮৩, ই.প্র ৫৪৭৯)।

ফিকাহ্:
প্রাতবেশীর সাথে সৎভাব রাখার অনেক ফাযীলাত। ছাগলের পায়ের ক্ষুর অতী নগন্য হলেও তা আদান প্রদানের মাধ্যমে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ফাযীলাত বা লাভ অনেক।

৭৫. প্রতিদিনের সব দোয়া কবুল হয় না কেন ?

"আবু হুরায়রা (রাদি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত রাসুলগণকে যে হুকুম দিয়েছেন মু'মিনগণকেও সেই একই হুকুম দিয়েছেন। তিনি (আল্লাহ্) বলেন: "হে রাসুলগণ! তোমারা পবিত্র ও হালাল জিনিস খাও এবং ভাল কাজ কর। আমি তোমাদের কৃতকর্ম সন্মন্ধে জ্ঞাত।" (সুরা মুমিনুন ২৩:৫১)। তিনি (আল্লাহ্) আরো বলেন:"তোমরা যারা ইমান এনেছ শোন! আমি তোমাদের যেসব পবিত্র জিনিস রিজিক হিসাবে দিয়েছি তা খাও এবং শুকরিয়া আদায় কর।" (সুরা আল-বাকারা ২:১৭২)।

"অতঃপর তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন। যে দূর দুরান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করে। ফলে সে ধুলি ধুসারিত রুক্ষ কেশধারী হয়ে পড়ে। অতঃপর সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, 'হে আমার রব' অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম,পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং আহার্য হারাম। কাজেই এমন ব্যক্তির দোয়া তিনি (আল্লাহ্) কি করে কবুল করতে পারেন।" (সহীহ্ মুসলিম ই.সে. হাদিস ২২১৬)।

ফিকাহ্:
আমাদের দেশে ধর্মের নামে বিভিন্ন বেশ ধারন করে আমাদের মত সরল বোকা মানুষকে ধোকা দিয়ে অনায়াসে তাদের জীবন জীবিকা উপার্জন করে চলছে। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয়, চাওয়া, পাওয়া নালিস, শালিশ ও 'দুআ' এমন লোকের নিকট পেশ করছি, যাদের ইমান-আকিদা, পোশাক থেকে আরম্ভ করে কোন কিছুই পাক ও পরিত্র নয়। কি করে এদের 'দুআ' কবুল হবে ? "আল্লাহ মুর্খ বা জাহেল জাতীকে পথ দেখায় না।"

৭৬. স্বপ্ন ৩ প্রকার, কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে তার কি করনীয়।

"আবু বাকর বিন আবু শায়বাহ্ থেকে হাওযাহ বিন খলীফা থেকে আওফ থেকে মুহাম্মদ বিন সীরীন থেকে আবু হুরায়রা (রাদি.) বর্নিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: স্বপ্ন তিন প্রকার। (১) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ, (২ বান্দার মনের খেয়াল এবং (৩) শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনমুলক কিছু। অতএব তোমাদের কেউ পছন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখলে তা ইচ্ছা করলে অপরের কাছে ব্যক্ত করতে পার। আর অপছন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখলে যেন তা ব্যক্ত না করে এবং উঠে সালাত পড়ে।" (সুনান ইবনু মাজাহ্

৩৯০৬,৩৯০৭, সহীহ্ বুখারী ৭০১৭, মুসলিম ২২৬৩, তিরমিযী ২২৭০,২২৮৩, আবু দাউদ ৫০১৯ . . .)।

৭৭. কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্নে দেখলে তার করনীয় হাদিস।

"মুহাম্মদ বিন রুমহ্ আল মিসরী থেকে লয়য বিন সা'দ থেকে আবু যুবয়র থেকে জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাদি.) বর্নিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে সে যেন, তার বাম দিকে তিন বার থুথ ফেলে, তিনবার আল্লাহ্র কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রর্থনা করে এবং সে যে দিকে কাৎ হয়ে শুয়েছিল তা যেন পরিবর্তন করে।" (সুনান ইবনু মাজাহ্ ৩৯০৮,৩৯০৯, মুসলিম ৩২৬২, আবু দাউদ ৫০২২ . . .)।

ফিকাহ্-

শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দু'আ "আউযু বিল্লাহি মিনাশ-শয়তোয়ানির্ রাজিম।" তিন বার থুথ ফেলার সাথে ৩ বার দু'আ বলা। অথবা তিন বার থুথ ফেলার সাথে ৩ বার শূধু "বিস্মিল্লাহ" বলা।

অন্য অধ্যায়ে আছে শয়তান ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে মানুষের সাথে খেলা করে।

"আবু হুরায়রা (রাদি.) বর্নিত, তিনি কলেন, এক ব্যাক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বললো, আমি স্বপে দেখলাম যে, আমার মথায় প্রহার করা হচ্ছে। আর প্রহারকারীকে দেখলাম যে, সে থর থর করে কাঁপছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ শয়তান তোমাদের কারো সাথে তামাসা করে, যাতে সে ভয় পায়। অত:পর সকাল বেলা সে লোকদের নিকট তা বলে বেড়ায়।"

আর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জাহিল বা মূর্খ তাবিজ ব্যবসায়ীরা নানা কৌশল ও কথা বলে তাকিজ, কবজ, সুতা লাতা শরীরে বেধে কত মুসলিমের ইমান নষ্ট করে। তাদেরকে জাহান্নামের টিকেট দিয়ে নিজেদের হারাম রোজগারের ধান্দা করে থাখে। বিষেশ করে মায়েরা তাদের সন্তানের প্রতি গভীর ভালবাসার কারনে তাদের অসুখ ও কান্না-কাটি রোধ করতে তাবিজ ব্যবসায়ীদের স্বরণাপন্য হয়, যা প্রকাশ্য শিরক।

৭৮. পাপ মুক্তিতে তওবা ও ইস্তিগফার।

অজ্ঞতা, অনীহা ও ভুলবশত পাপকাজ করে থাকি। প্রতিদিন আমরা অজ্ঞতা, অনীহা ও ভুলবশত পাপ-কাজ করে থাকি। এর পরিণতি ও দুর্ভোগ থেকে মুক্তির জন্য তওবার সুযোগ আছে। আদম আঃ থেকে আজ পর্যন্ত যত মানুষ ভুল করেছে তওবার মাধ্যমে পুনরায় সঠিক রাস্তায় ফিরে এসেছে এবং মুক্তি পেয়েছে। তওবার গুরুত্ব এত

বেশী যার উপর একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরা তওবা'। এ সূরায় অনেকগুলো তওবার ঘটনা ও বিষয় উল্লেখ আছে। কীভাবে তওবা করতে হবে তার উদাহরণ, পদ্ধতি, সময় কাল ও স্থানের বিষয়ে কুরআন ও হাদিস অনুশীলন প্রয়োজন।

আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার দুটি দিক রয়েছে: (১) তওবা অর্থাৎ কৃত পাপ থেকে ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা। (২) ইস্তিগফার অর্থাৎ পূর্বে কৃত পাপ মুক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

<u>তওবা ও ইস্তিগফার কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত নিম্নরূপ:</u>

১) পাপ পরিত্যাগ করা ও পুনর্বার সে পাপ না করার দৃঢ় সংকল্প নেয়া।
২) পাপ অপরাধ তা স্বীকার করা এবং সে জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া।
৩) পাপ বর্জন করে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা।
৪) পাপের সাথে কোন মানুষের বা সৃষ্টির অধিকার জড়িত থাকলে তা ফেরত দেওয়া অথবা ক্ষমা চেয়ে নেয়া।
৫) পাপের পর দ্রুততার সাথে তওবা করা উত্তম; তওবার শেষ সময় মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। কিন্তু মৃত্যুর সময় কার জানা নেই। তাই নিয়মিত ইস্তিগফার করা উত্তম।

কুরআন থেকে তওবার আয়াত সমুহ-

(১) সৃষ্টির প্রথম মানুষ আদম (আঃ) এর তওবার বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "তারপর আদম তার রবের নিকট থেকে কিছু বানী শিখে নিল। আল্লাহ তার ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা বাকারা ২:৩৭)।

(২) পাপের বিষয় ব্যক্ত করে তওবার জন্য আল্লাহ বলেন: "কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে আর সুস্পষ্টভাবে যা গোপন করেছিল তা ব্যক্ত করে, এদেরই তওবা আমি কবুল করি। আমি তো পরম তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" (সূরা বাকারা ২: ১৬০)।

(৩) সূদ পরিত্যাগ করে তওবা না করলে, আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে তৈরি হওয়ার জন্য চরম পত্র দিয়ে আল্লাহ বলেন: "হে মু'মিনগন! যারা ইমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা কিছু বকেয়া রয়ে গেছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাক। তারপর যদি তোমরা (সুদ) পরিত্যাগ না কর, তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে তৈরি হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন রয়ে যাবে। তোমরা কাউকে অত্যাচার করবে না এবং তোমাদেরকে কেউ অত্যাচার করবে না।" (সূরা বাকারা ২:২৭৮-২৭৯)।

(৪) কুফরীর পর তওবার বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "তবে তাদের ব্যাতিরেকে যারা এরপর তওবা করে নেয় এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-ইমরান ৩:৮৯)।

(৫) কখনও কোন অশ্লীল কাজের পর তওবার বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "এবং যারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং ক্ষমা প্রর্থনা করে নিজেদের অপরাধের জন্য। আল্লাহ ছাড়া কে আছে যে অপরাধ মার্জনা করবে? তারা যা করে ফেলে জেনে শুনে তাঁর পুনরাবৃত্তি করে না।" (সূরা আল-ইমরান ৩:১৩৫)।

(৬) ব্যাভিচারকারিনীদের তওবার বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "তোমাদের মধ্যে যে দুজন এ কুকর্মে (ব্যাভিচারে) লিপ্ত হবে, তাদের শাস্তি দেবে; তবে যদি তারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়; তাহলে তাদের রেহাই দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে ফেলে, তারপর অবিলম্বে তওবা করে; এরূপ লোকের তওবাই আল্লাহ কবুল করেন।
আল্লাহ সর্বজ্ঞ,হেকমতওয়ালা।" (সূরা নিসা ৪: ১৬-১৭)।

(৭) জুলুমকারীর তওবার বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করে অথবা নিজের জুলুম করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় বা তওবা করে, সে আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে।" (সূরা নিসা ৪:১১০)।

(৮) যারা সংশোধন করে তাদের তওবার বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "অবশ্য যারা তওবা করে, নিজেদের সংশোধন করে, আল্লাহর পথকে দৃঢ়ভাবে আঁকরে ধরে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে স্বীয় দ্বীনে একনিষ্ঠ থাকে, তারা থাকবে মু'মিন্দের সঙ্গে। আর অচিরেই আল্লাহ মু'মিন্দের মহা পুরুস্কার প্রদান করবেন।" (সূরা নিসা ৪: ১৪৬)।

(৯) জুলুম কারীর তওবার বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "তারপর যে তওবা করে নিজের এ যুলুম করার পর এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা মায়িদা ৫: ৩৯)।

(১০) যারা তওবা ও ইস্তিগফার করে না তাদের বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "তবে কি তারা আল্লাহর কাছে তওবা করে না এবং তার কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করবে না? আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা মায়িদা ৫:৭৪)।

(১১) মন্দ কাজের পর তওবার বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "আর যারা মন্দ কাজ করে পরে তওবা করে নেয় এবং ইমান আনে, তবে নিশ্চয় তোমার রব সেই তওবার পর অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আ'রাফ ৭:১৫৩)।

(১২) সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদানকারীদের তওবার বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "তবে তারা যদি তওবা, সালাত কায়েম করে, ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দ্বীনের

ভাই। আমি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে থাকি আয়াতসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য।" (সূরা আত-তওবা ৯:১১)।

(১৩) তওবার তৌওফিক দেন যাদের ইচ্ছে করেন, এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "আর আল্লাহ এরপরও তওবার তৌওফিক দেন যাদের ইচ্ছে করেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আত-তওবা ৯:২৭)।

(১৪) আল্লাহ একমাত্র তওবা কবুলকারী এ বিষয়ে তিনি বলেন: "তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবা কবুল করেন এবং তিনিই সাদকা গ্রহণ করেন?, আর একমাত্র আল্লাহই তওবা কবুলকারী। পরম দয়ালু।" (সূরা আত-তওবা ৯:১০৪)।

(১৫) তওবাকারী মুমিনের খোশখবরে আল্লাহ বলেন: "তারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, রোজাদার (ভ্রমনকারী), রুকুকারী, সিজদাকারী, ভাল কাজের আদেশদাতা, মন্দ কাজে বাধা প্রদানকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাজতকারী; (এসব গুনে গুণান্বিত) মূ'মিন্দেরকে আপনি খোশখবর শুনিয়ে দিন।" (সূরা আত-তওবা ৯: ১১২)।

(১৬) তিনজন সাহাবা, কা'ব ইবনে মালেক (রাদি.), মুরারাহ ইবনে রাবিআ আল-আমরী (রাদি.), হিলাল ইবনে উমাইয়া আল-ওয়াকিফী (রাদি.) হুনায়ুনের জিহাদে অংশ গ্রহণ না করায় তাদের তওবা কিভাবে কবুল হয়েছিল এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "আর ঐ তিন ব্যক্তির ও তিনি কৃপাদৃষ্টি দান করলেন যাদের ব্যাপার মুলতবী রাখা হয়েছিল। এমনকি যখন জমিন প্রসস্ত হওয়া সত্বেও তাদের উপর সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবনও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ল। আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া ছাড়া কোন আশ্রয় পাওয়ার উপায় নেই, তখন তিনি তাদেও কৃপাদৃষ্টি দান করলেন, যাতে তারা তওবা করে। নিশ্চয় আল্লাহই পরম তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।" (সূরা আত-তওবা ৯: ১১৮)।

(১৭) বিপর্যস্তদের তওবার বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "তারা কি দেখে না যে, তারা বছর একবার কি দু'বার বিপর্যস্ত? তবুও তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।" (সূরা আত-তওবা ৯: ১২৬)।

(১৮) অজ্ঞাত বসত মন্দ কাজের তওবার বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "যারা অজ্ঞাত বশত মন্দ কাজ করে পরে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, নিশ্চয় আপনার রব এসবের পরে অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা নাহল ১৬:১১৯)।

(১৯) তওবা কারীর উপর জুলুম করা হবে না বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "তবে তারা নয়, যারা তওবা করেছে, ইমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের কোন জুলুম করা হবে না।" (সূরা মারিয়াম ১৯:৬০)।

(২০) তওবাকারী ও সৎপথে অটল থাকার বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "'আমি তাঁর জন্য অবশ্যই ক্ষমাশীল, যে তওবা করে, ইমান আনে, নেক কাজ করে ও সৎপথে অটল থাকে।" (সূরা ত্বহা ২০: ৮২)।

(২১) নিজেদের সংশোধনকারীর তওবার বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "কিন্তু যারা এরপরও তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধনকরে নেয়, তবে আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা নূর ২৪: ৫)।

(২২) নেককারের তওবার বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "কেয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে এবং তথায় সে অনন্তকাল লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে। তবে তারা নয় যারা তওবা করে, ইমান আনে ও নেক কাজ করে; আল্লাহ এরূপ লোকদের পাপসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যে ব্যক্তি তওবা করে এবং নেক কাজ করে, সে তো বাস্তবিকই আল্লাহ অভিমুখী হয়।" (সূরা ফুরকান ২৫: ৬৯-৭১)।

(২৩) নেককারের তওবার বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "তবে অবশ্যই যে ব্যক্তি তওবা করেছে, ইমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আশা করা যায় সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা কাসাস ২৮:৬৭)।

(২৪) বান্দার তওবার বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "আর তিনিই স্বীয় বান্দার তওবা কবুল করেন এবং পাপ মার্জনা করেন। আর তোমরা যা কর তিনি তা জানেন।" (সূরা শূরা ৪২: ২৫)।

(২৫) তওবাকারীর অন্তরের খবর বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "তোমাদের 'রব' খুব ভাল করে জানেন যা তোমাদের অন্তরে আছে তা। তোমরা যদি নেককার হও তবে তিনি তো তওবাকারীদের জন্য পরম ক্ষমাসীল।" (সূরা বনী ইসরাইল ১৭: ২৫)।

(২৬) ইমানদারদের তওবা করার জন্য আল্লাহ বলেন: "হে যারা ইমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর খাঁটি তওবা। আশা করা যায় তোমাদের 'রব' তোমাদের মন্দকর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার নিম্নদেশে নহরসমূহ। সেদিন নবী ও তাঁর মু'মিন সঙ্গীদেরকে আল্লাহ অপদস্ত করবেন না। তাদের নুর তাদের সামনে ও তাদের ডান দিকে ছুটাছুটি করবে। তারা বলবেঃ হে আমাদের 'রব'! আমাদের নুরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন করুন, আপনি তো সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।" (সূরা তাহরীম ৬৬:৮)।

(২৭) ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহ বলেন: "বলুন: আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ। আমার কাছে ওহী নাযিল করা হয় যে, তোমাদের মাবুদ একজন, অতএব তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে ধারন কর। তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ।" (সূরা হামিম সাজদাহ ৪১:৬)।

(২৮) নবী ইউনুস (আঃ) এর ইস্তিগফার:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

"আপনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আপনি পবিত্র, আমি তো জালিম।" (সূরা আম্বিয়া ২১: ৮৭ অংশ)। এ ছাড়া আরও অনেক আয়াতে আল্লাহ তওবার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। আমরা সবাই কমবেশি পাপ করি। সুতরাং পাপের শাস্তি ও দূর্ভোগ থেকে বাঁচার জন্য তওবা ছাড়া কোন উপায় নেই।

বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে পাপ মাফ হয়ে যায়:

(ক) পাপ থেকে ইস্তিগফার ও তওবা করলে পাপ মাফ হয়।
(খ) নেকি বা ভাল কাজ করলে পাপ মাফ হয়।
(গ) বালা-মুসিবত, বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করলে পাপ মাফ হয়।
(ঘ) মৃত আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে দান খয়রাত ও দুআর মাধ্যমে পাপ মাফ হয়।

হাদিস থেকে তওবা ও ইস্তিগফারের বিষয়:

কুরআনুল কারীমে মু'মিনগণকে বারবার তওবা ও ইস্তিগফার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তওবা ও ইস্তিগফারের জন্য ক্ষমা, পুরস্কার ও মর্যাদা ছাড়াও জাগতিক উন্নতি ও বরকতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অনুরুপভাবে, বিভিন্ন হাদীসে ইস্তিগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৭৯. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইস্তিগফারের হাদিস।

"আবু হুরায়রা (রাদি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: 'আল্লাহর কসম! আমি দিনের মধ্যে ৭০ বারেরও বেশী আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং তওবা করি।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুত দাওইয়াত বা ইসিগফার ১/২৩২৪)।

৮০. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইস্তিগফারের হাদিস।

"আবু বুরদাহ্ (রাদি.) থেকে আগার আল-মুযানী রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: 'হে মানুষেরা, তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর। নিশ্চয় আমি এক দিনের মধ্যে ১০০ বার আল্লাহর নিকট তওবা করি বা ইস্তিগফার করি।" (সহীহ মুলিম বা.ই.সে. ৬৬৬৬ হাদীসের অংশ)।

(১) সংক্ষিপ্ত ইস্তিগফার: اَسْتَغْفِرُ الله

উচ্চারণ: 'আস্তাগফিরুল্লাহ'। অর্থ: "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

(২) সংক্ষিপ্ত ইস্তিগফার: أَسْتَغفِرُ اللهَ وأَتُوبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ: 'আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি।'

অর্থ: "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁর দিকে ফিরে আসছি।"

(৩) বিস্তারিত ইস্তিগফার: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

উচ্চারণ: 'রাব্বিগ ফিরলী, ওয়া আতূব আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত তাওয়া-বুল গফুর।' অর্থ: "হে আমার রব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তওবা কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী ক্ষমাকারী।" (তিরমিযি, হাদিস-৩৪৩৪)।

(৪) বিস্তারীত ইস্তিগফার:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيهِ

উচ্চারণ: "আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাজী লা ইলাহা ইল্লা-হুয়াল হাইউল কাইউম ওয়া আতূবু ইলাইহি।" অর্থ: "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীবে ও সর্ব সংরক্ষক, এবং তাঁর কাছে 'তওবা' করছি।"

(৫) তাওবার মধ্যে উত্তম সায়্যিদুল ইস্তিগফার:

ইস্তিগফার হচ্ছে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। যা তাওবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কুরআন-হাদীসে 'ইস্তিগফার'-এর অনেক ফযিলত রয়েছে। হাদীসে যে সব ইস্তিগফার বর্ণিত হয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ইস্তিগফার হচ্ছে 'সায়্যিদুল ইস্তিগফার' যা বুখারীসহ অনেক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে-

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণ: "আল্লাহুম্মা আন্তা-রাব্বি, লা-ইলাহা ইল্লা-আন্তা খালাক্বতানী। ওয়া আনা-আবদুকা, ওয়া আনা আলা-আহদিকা, ওয়া-ওয়াদিকা মাছতা-ত্বায়'তু আউযুবিকা মিন্-শাররি মা-ছানা'তু, আবুউলাকা বিনিয়া-মাতিকা আলাইয়া। ওয়া আবুউলাকা বি-যামবী ফাগফিরলী, ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয-যুনূবা ইল্লা আন্ত।"

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমার 'রব'। আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি সাধ্যমত আপনার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গিকারাবদ্ধ রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আমার প্রতি আপনার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি। আর আমি আমার গুনাহ স্বীকার করছি, অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার কেউ নেই।" (সহীহ বুখারী, হাদিস-৬৩০৬)।

৮১. সায়্যিদুল ইস্তিগফারের হাদিস।

"শাদ্দাদ ইবনু আউস রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেছেন: সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার হলো বান্দার "এ দু'আ পড়া"। যে ব্যক্তি দিনে (সকালে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই ইস্তিগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হবার আগেই সে মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (প্রথম ভাগে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই ইস্তিগফার পড়ে নেবে আর সে ভোর হবার আগেই মারা যাবে সে জান্নাতী হবে।" (সহীহুল বুখারী, বাব-আদ্‌দু'য়া ৮০/১; তা.পা. ৬৩০৬; আ:প্র. ৫৮৬১, ই.প্র ৫৭৫৪)।

৮২. যে কোন বৈঠক শেষে দু'আ।

কোন বৈঠকের শেষে ভুল-ত্রুটি থেকে ক্ষমা প্রার্থনা ও মজলিসের কাফ্‌ফারাহ্‌র জন্য দু'আর হাদিস-"আবু বারযাহ্ আল-আসলামী (রাদি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) যখন কোন বৈঠক শেষ করে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন: ***'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশ-হাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।*** " . . . . অর্থ- "হে আল্লাহ্ আপনি পবিত্র এবং আপনারই প্রশংসা করছি, আপনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহা নেই, আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং অনুতপ্ত হয়ে আপনার নিকট ফিরে আসছি।" আমীন! (আবু দাউদ ৪৮৫৭, ৪৮৫৯, ইবনে কাসির)।

আল্লাহ্ আমাদেরকে নারী জাতির ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

----------সমাপ্ত----------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

‘১নং–সুরা আল–ফাতিহা’

বিস্‌মিল্লা–হির রাহমা–নির রাহীম।
“(শুরু করিলাম) ল’য়ে নাম আল্লাহ্‌র
করুনা ও দয়া যার অশেষ অপার।
সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লাহ্‌র মহিমা,
করুণা কৃপার যার নাই নাই সীমা।
বিচার–দিনের বিভু ! কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদের চালাও,
যাদের বিলাও দয়া সে পথ দেখাও।
অভিশপ্ত আর পথভ্রষ্ট যারা, প্রভু,
তাদের পথে যেন চালায়ো না কভু।”
(কবিতার ছন্দে বাংলা অনুবাদ, কাজী নজরুল ইসলাম,
ইসলামী কবিতা পৃষ্ঠা ১৪৮ ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।

‘১১২ নং–সুরা ইখলাস’

বিস্‌মিল্লা–হির রাহমা–নির রাহীম।
“বল, আল্লাহ্‌ এক! প্রভু ইচ্ছাময়,
নিস্কাম নিরপেক্ষ অন্য কিছু নয়।
করেন না কাহারেও তিনি যে জনন,
কাহারও ঔরস–জাত তিনি নন।
সমতুল্য তাঁর নেই কেহ আর।”
(কবিতার ছন্দে বাংলা অনুবাদ, কাজী নজরুল ইসলাম,
ইসলামী কবিতা পৃষ্ঠা ১৪৯ ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।

সহায়ক বই ও নির্দেশ:

* আল-কোরানুল কারীমের বাংলা অনুবাদ: মুহিউদ্দিন খান, আবুধাবী।
* কুরআনের বঙ্গানুবাদ: ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান, খোশরোজ কিতাব মহল।
* কুরআনুল কারীমের বঙ্গানুবাদ: ডঃ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান।
* তাফসীর আহসানুল বায়ান অনুবাদ: মাওলানা সালাউদ্দীন, সউদী আরব।
* কুরআনুল কারীম-বাংলা অনুবাদ: ডঃ জাকারিয়া, সউদী আরব।
* আল-ফিকহুল আকবর: বঙ্গানুবাদ ডঃ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির (রহ.)।
* কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ সজ্জা: বইয়ের লেখক ও ইন্টারনেটে যার অনেক লেকচার রয়েছে, ডঃ খন্দকার আবদুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর।
* কুরআন- হাদিছের মানদন্ডে সূফীবাদ: আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী।
* আকিদার মানদন্ডে তাবীজ আনুবাদে: প্র.মুজিবর, সউদী আবর।
* 'নজরুল ইসলাম' ইসামী কবিতা- ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ই.ফা) ঢাকা।
* সহীহুল বুখারী-বাংলা অনুবাদ: তাওহীত পাবলিকেশন (তা.পা.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ই.ফা), আধুনিক প্রকাশনী (আ:প্র.), হাদিস একাডেমী (হা.এ) ঢাকা।
* বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক। "আকাইদ ও ফিক্‌হ" ইবতেদায়ি মাদরাসা ১ম-৫ম শ্রেনি পর্যন্ত। "আল আকায়েদ ওয়াল ফিক্‌হ" দাখিল মাদরাসা ৬ষ্ট-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ।
* বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক। প্রাথমিক স্কুল ৩য়-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত "ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা"। মাধ্যমিক স্কুল ৬ষ্ট-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত "ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা"।
* এ ছাড়া যাদের লেখা আরবি, বাংলা ও ইংরেজী বই ও প্রবন্ধ থেকে উদ্বৃতি সংযোযিত ও সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আল্লাহর নিকট তাদের জন্য উত্তম বিনিময় প্রার্থনা করছি।

মাসজিদ আল-হারাম, মাক্কাহ্‌তুল মুকাররামা।

মাসজিদ রাসূলুল্লাহ্‌ , মাদিনা আল-মুনাওয়ারা।

মাসজিদ আল-আকসাহ্‌ , জেরুজালেম।

প্রকাশকঃ বিস্‌মিল্লাহ্‌ লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী

ক-৩৪বি, খিলখেত সুপার মার্কেট, ঢাকা ১২২৯

কুর্মিটোলা হাই স্কুলের সামনে।

০১৭২৬-১৭৪৫৯০, ০১৯২৩-৭৬৩৭৪০